প্রগতিশীল শিক্ষা

প্রগতিশীল শিক্ষা

ডাঃ কার্লটন ওয়াশবার্ন কর্তৃক লিখিত
What is Progressive Education
হইতে অনূদিত

অধ্যাপক শ্রীঅনাথনাথ বসু কর্তৃক লিখিত
গ্রন্থপরিচয় সহ

অনুবাদিকা
ডাঃ শ্রীমতী সুনীতি দত্ত
ও
শ্রীমতী ক্ষণিকা বসু

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
২ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা — ১২

প্রকাশক
শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়
ম্যানেজিং ডিরেক্টার
এ, মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
২ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ, বৈশাখ, ১৩৬৫

মূল্য ২৲ (দুই টাকা) মাত্র

মুদ্রাকর
শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিঃ
৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯

সূচীপত্র

গ্রন্থপরিচয়

কার্লটন ওয়াশবার্ন (Dr. Carlton Washburne) যুক্তরাষ্ট্রের একজন সুপরিচিত শিক্ষাতত্ত্ববিদ্। কৈশোরে তিনি আমেরিকার বিখ্যাত শিক্ষাতাত্ত্বিক কর্নেল পার্কারের নিকট শিক্ষালাভ করেন। যৌবনে তিনি বিশ্ববিশ্রুত দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ্ জন ডিউইর সংস্পর্শে আসেন। ডিউই তাঁহার মাতার বন্ধু ছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশের শিক্ষাবিদ্গণের মনে প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। তাহারই ফলে আজ যাহাকে আমরা প্রগতিশীল শিক্ষা বা নবীন শিক্ষা বলি সেই আন্দোলনের জন্ম হয়। আমেরিকাতে এই নূতন মতবাদ Progressive education নামে পরিচিত। ইংলণ্ডে ও ইউরোপে ইহার নাম New education। এই আন্দোলনের মুখপাত্র আমেরিকায় Progressive Education Association নামে অভিহিত, ইংলণ্ডে ও অন্যত্র তাহার নাম New Education Fellowship ; ধীরে ধীরে এই আন্দোলন অন্যান্য দেশে ছড়াইয়া পড়ে এবং তাহার প্রভাবে প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে নানা পরিবর্তন ঘটে।

এই আন্দোলনের জন্মাবধি কার্লটন ওয়াশবার্ন ইহার সহিত যুক্ত। দীর্ঘকাল ধরিয়া তিনি ইহার নেতৃত্ব করিয়াছেন। তিনি অনেক দিন Progressive Education Association-এর প্রধান (President) পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পরে তিনি New Education Fellowship-এর আন্তর্জাতিক সংস্থার সভাপতি হন। সম্প্রতি তাঁহার স্থানে আমাদের

দেশের সুপরিচিত শিক্ষাবিদ্ খাজা গোলাম সৈয়দঅইন সেই পদ লাভ করিয়াছেন।

কার্লটন ওয়াশবার্ন American Education Research Association-এর সভাপতিরূপে শিক্ষাবিষয়ক নানা গবেষণা করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে বিখ্যাত উইনেট্কা প্রণালীর তিনি উদ্ভাবয়িতা। উইনেট্কা শিকাগোর নিকটে অবস্থিত একটি গণ্ডগ্রাম। কার্লটন ওয়াশবার্নের জন্য ইহা আজ জগতের সর্বত্র শিক্ষক-সমাজে সুপরিচিত। উইনেট্কা প্রণালীর ভিত্তি প্রগতিশীল শিক্ষাতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত।

কার্লটন ওয়াশবার্ন শিক্ষাবিষয়ে অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন; শিক্ষাতত্ত্ববিদ্-সমাজে সেগুলি সুপরিচিত। তাঁহার রচিত সকল গ্রন্থেরই উপপাদ্য প্রগতিশীল শিক্ষাতত্ত্ব ও তাহার ব্যাবহারিক প্রয়োগ। ওয়াশ-বার্নের কয়েকটি গ্রন্থের নাম এইখানে উল্লেখ করা হইল।

A Living Philosophy of Education
New Schools in the Old World
Better Schools
Remakers of Mankind
Schools are not what they were

Remakers of Mankind নামক গ্রন্থে গান্ধীজীর কথা আছে। ওয়াশবার্ন ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। এদেশে আসিয়া তিনি গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সঙ্গে শিক্ষাবিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলেন। ওয়াশবার্ন ভারতবর্ষের অনুরাগী ও বন্ধু।

প্রগতিশীল শিক্ষা বলিতে কি বোঝায় তাহাই ব্যাখ্যা করিয়া তিনি What is Progressive Education গ্রন্থটি পিতামাতা ও

অভিভাবকগণের উদ্দেশে রচনা করেন। গ্রন্থটি সুখপাঠ্য ও সরল ভাষায় রচিত। ইহার আবেদন সহজেই মনকে স্পর্শ করে।

আমাদের দেশে আমরা আজ নূতন করিয়া শিক্ষাপদ্ধতির সংস্কার করিতেছি; এই সময়ে এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি সম্বন্ধে আমাদের অবহিত হওয়া উচিত। এই উদ্দেশ্য লইয়াই বাঙলা-ভাষাভাষী পাঠক সাধারণের জন্য এই অনুবাদ প্রকাশিত করা হইল।

ডাঃ ওয়াশবার্ন সানন্দে এই অনুবাদ প্রকাশের ভার আমায় দেন। আমার দুইটি ছাত্রী ডাঃ কুমারী সুনীতি দত্ত ও কুমারী ক্ষণিকা বসু এই অনুবাদটি করেন ও 'শিক্ষা' পত্রিকায় ইহা প্রথমে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। এ, মুখার্জী কোম্পানির স্বত্বাধিকারী শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায় ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার ভার লওয়ায় আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

সেন্ট্রাল ইনস্টিট্যুট অব এডুকেশন
দিল্লী ১৪ জুলাই, ১৯৫৭

শ্রীঅনাথনাথ বসু

প্রথম অধ্যায়

প্রগতিশীল শিক্ষা কাহাকে বলে?

প্রগতিশীল শিক্ষা কাহাকে বলে এবং ইহার মূল উদ্দেশ্য কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে যে এই নূতন শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হইল সহজ, স্বাভাবিক এবং শিশুর রুচি-সম্মত ভাবে তাহার জ্ঞান বিস্তার করা এবং এই শিক্ষার পরিণাম হইল নিজের, দশের ও দেশের কল্যাণ সাধন।

শিক্ষার বিষয়বস্তু যদি অর্থহীন হয় তাহা শিশু সহজে উপলব্ধি করিতে পারে না বা অতি কষ্টের সহিত হৃদয়ঙ্গম করিলেও তাহা চিরস্থায়ী ভাবে মনে গাঁথিয়া রাখিতে পারে না, এইজন্য অর্থহীন শিক্ষাবস্তুর সাহায্যে যেন শিশুদের শিক্ষা না দেওয়া হয় ইহাই প্রগতিশীল শিক্ষার প্রাণপণ চেষ্টা। নিম্নলিখিত উদাহরণ দ্বারা ইহা আরও ভালরূপে প্রমাণিত হইবে।

যদি কোন শিশুকে তুইটি বাক্য মুখস্থ করিতে বলা হয়, যথা—

১। আমি স্কুলে যাইতে ভালবাসি,

২। ডি গে নে চাউং মাতোয়া বাবু,

তবে প্রথম বাক্যটি শিশুরা সহজেই বুঝিতে পারিবে এবং মনে রাখিতে পারিবে। দ্বিতীয়টি অনেকবার মুখস্থ করিয়া

মনে রাখিলেও তাহা কিছুদিন পরে ভুলিয়া যাইবে। পুরাতন শিক্ষাপদ্ধতির বিষয়বস্তু ছিল এমনই অর্থহীন। আট বৎসরের ছেলেকে ৯ × ৬ = ৫৪, ছ নয় চুয়ান্ন মুখস্থ করিতে দেওয়া হইত, সেইরূপ দশ বৎসরের ছেলেকে এক ভগ্নাংশকে আর এক ভগ্নাংশ দিয়া ভাগ করিতে দিয়া বলা হইত—প্রথম ভগ্নাংশকে দ্বিতীয় ভগ্নাংশের 'হর'এর স্থানে 'লব' এবং 'লব'এর স্থানে 'হর' বসাইয়া গুণ কর। এইরূপ শিক্ষা শিশুর নিকট অর্থপূর্ণ ছিল না, কারণ সে তাহার নিজের দৈনিক জীবনযাত্রার সহিত ইহার কোন সম্পর্কই খুঁজিয়া পাইত না। শিশু উপলব্ধির সাহায্যেই জ্ঞানলাভ করে, এবং এই ভাবে যাহা সে মনে রাখিবার বিশেষ কোন চেষ্টা বা আগ্রহ করে না তাহাও তাহার মনে গাঁথিয়া যায়—ইহাই প্রকৃত শিক্ষা। এই সত্যকেই ভিত্তি করিয়া প্রগতিশীল শিক্ষাপ্রণালীর ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ভূমিষ্ঠ হইবার সময় হইতেই অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া শিশুর শিক্ষা আরম্ভ হয়। তাহার নানা বিচিত্র রকমের প্রশ্ন হইতেই বোঝা যায় যে সে নানা বিষয় জানিতে ও শিখিতে ইচ্ছুক। সে যাহা কিছু জানিয়া বা বুঝিয়া লয়, তাহা তাহার কথায়, কাজে ও খেলায় প্রকাশ পায়। প্রগতিশীল শিক্ষা শিশুর এই নিজস্ব এবং স্বাভাবিক জ্ঞান অর্জনের ইচ্ছাটাকে মূলধনস্বরূপে গ্রহণ করে এবং তাহার আপন কাজের ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তাহাকে নূতন জ্ঞানলাভ করিতে সাহায্য করে। ইহাতে শিক্ষার বিষয়বস্তু যে শুধু অর্থযুক্ত ও রুচিদায়ক হয় তাহা নহে,

শিক্ষাও লাভজনক হয়। প্রগতিশীল শিক্ষা স্বীকার করে যে বিদ্যালয় জ্ঞানবিস্তারের এক বিশেষ কেন্দ্রস্থল, কিন্তু ইহাও মানিয়া লয় যে শিশু তাহার পরিবারের ও সমাজের সহিত আদানপ্রদানের মধ্য দিয়া আরও অনেক বিষয় সহজে স্বাভাবিকভাবে শিখিয়া লয়। এই সামাজিক শিক্ষাও নবীনপন্থী বিদ্যালয়ের এক প্রধান লক্ষ্য।

প্রত্যেক শিশু একটি জটিল জীবন্ত সত্তা। কোন দুইটি শিশু হুবহু এক রকম এমন দেখা যায় না। দুইটিতে ব্যক্তিগত বৈষম্য কিছু থাকিবেই থাকিবে। এইজন্য শিশুদের নানান প্রয়োজন ও বাসনা, তাহাদের জীবিকানির্বাহের পৃথক পৃথক পথ, পরিবারের ও সমাজের প্রতি তাহাদের প্রত্যেকের নানাবিধ কর্তব্য এবং তাহাদের প্রত্যেকের নিকট সমাজের বিভিন্ন দাবী, এই সব জানিয়া বুঝিয়া শিশুর শিক্ষার আয়োজন করিতে হইবে। এই প্রশ্নগুলির যথাযথ সমাধান লাভের জন্য বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও গবেষণার প্রয়োজন। পরবর্তী অধ্যায়ে এই নূতন যুগে শিক্ষায় বিজ্ঞানের দান সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিজ্ঞান ও শিক্ষা

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর কাল পূর্বে শিক্ষা বিষয়ে বিজ্ঞানের প্রায় কিছু বলিবার অধিকার ছিল না। আমরা কি পড়াইব, কি ভাবে পড়াইব—এ সকল বিষয়ে নির্দেশ বিজ্ঞানের কাছে পাইবার আশা খুব কমই ছিল। এমন কি এ যুগেও শিক্ষায় অধিকাংশই বিজ্ঞানসম্মত নহে। কেবল একপ্রকার গতানুগতিক পথ অনুসরণ করিয়া সাধু উদ্দেশ্যের দোহাই পাড়িয়া কাজ চলিতেছে। শিশুর শরীরের ক্রমবৃদ্ধি এবং তাহার শিক্ষার ক্রমোন্নতি প্রভৃতি জানিবার জন্য আমাদের মধ্যে কম লোকই বিজ্ঞানের সাহায্য লইয়া থাকেন।

আজকাল বিভিন্ন বিজ্ঞান, বিশেষ করিয়া যেগুলি মানুষের জীবনকে কেন্দ্র করিয়া গবেষণা করিয়াছে, সেই সব বিজ্ঞান শিক্ষাবিষয়ে নূতন কিছু বলিবার দাবী জানাইয়াছে। উদাহরণ ধরিয়া বিচার করিলে বিষয়টি পরিষ্কার হইবে।

প্রায় চল্লিশ বৎসর আগে Sherrington নামে জনৈক শরীরতত্ত্ববিদ্ গবেষণা দ্বারা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাইলেন যে মানুষের শরীরের স্নায়ুমণ্ডলীর ক্রিয়া অংশে অংশে বিচ্ছিন্নভাবে সম্পন্ন হয় না। শরীরের প্রত্যেক অংশই প্রত্যেক বাহ্যিক

উত্তেজনায় সাড়া দেয়, বই পড়িবার সময় কেবল চক্ষুই কাজ করিতেছে এমন নহে, কিংবা মস্তিষ্কের বিশেষ কোন অংশেই যে কেবল ভাবনা খেলিয়া যাইতেছে তাহাও নহে। জিহ্বায় এবং স্বরনালীতে অজ্ঞাতে যে মৃদু স্পন্দন হয়, তাহাও মাপকাঠিতে তোলা যায়। কথা বলিবার সময় শরীরের নানা অংশে প্রতিক্রিয়া হয়, চক্ষুপেশী চক্ষুকে চালিত করে, বিভিন্ন অঙ্গের মাংসপেশী এরূপ পরস্পরের সহায়তা করে, যাহাতে শরীরে বিশেষ কোন চাপ বা শ্রম না হয়। শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি, হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া, পরিপাকযন্ত্রের ক্রিয়া, সব কিছুর উপরই কিয়দংশে প্রভাব পড়িতেছে ; ফলে মনের উপরও প্রভাব হইবে ইহা বিচিত্র কি ? পড়িবার সময় মনে কতকগুলি পুরাতন অভিজ্ঞতার সহিতও যোগাযোগ ঘটে। ইহা গেল জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে। আবার কোন কোন শব্দ মনে ভাবের (emotion) সঞ্চার করে। তাহারও প্রতিক্রিয়া শরীরের উপর হয়। এ কথা ঠিক যে কোন বিষয় দুর্বোধ্য হইলে তাহার প্রতিক্রিয়া অন্যরূপ হয়। কেবল তুর্কী ভাষা জানেন এরূপ লোকের সম্মুখে ইংরাজী সাহিত্যের কোন বই রাখিলে তাহা কালো আঁচড়ের অর্থহীন রেখা বলিয়াই বোধ হইবে।

শেরিংটনেরও (Sherrington) পরবর্তী গবেষণাগুলিতে এই একই কথা বলা হইয়াছে যে 'শিক্ষা' শিক্ষার মত হইতে হইলে মানুষের পরিপূর্ণতাকেই উহার লক্ষ্য করিতে হইবে। একেবারে পৃথক্ করিয়া বুদ্ধিবৃত্তিমূলক শিক্ষা (intellectual

education) দেওয়া অসম্ভব। শরীর, অভিজ্ঞতা, অনুভূতি সবই মানুষের ভিন্ন ভিন্ন অংশ। সেইজন্য বর্তমানে শিক্ষার অর্থ হইতেছে "সর্বাঙ্গীন শিক্ষা" (education of the whole child), এবং ইহাই বর্তমান যুগের যথার্থ শিক্ষা।

চিকিৎসাশাস্ত্র হইতেও এই জ্ঞান আমরা পাই যে, শরীর, মন, অনুভূতি একত্রে "সমগ্র মানুষটির" (whole human being) পরিচয় দেয়। ইহাদিগকে পৃথক করার অথবা পৃথক-ভাবে বিচার করার কোন অর্থই হয় না। তাঁহারা আরও বলেন যে "গ্যাস্ট্রিক আলসার" রোগটি দৈহিক সন্দেহ নাই, তবে তাহার উৎপত্তির কারণ মানসিক কোন ভয় বা ভাবনা বলিয়া জানা যায়। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে আংশিক ভাবে মানুষকে জানিবার চেষ্টা নেহাতই নির্বুদ্ধিতা, তবে একথা সকলে জানেন যে শিশু অসুস্থ হইলে প্রতিকূল অবস্থায়ও মায়ের স্নেহের আশ্রয়েই সে তাড়াতাড়ি সুস্থ হইয়া উঠে।

আনন্দের বিষয় এই যে আজকাল নবীনপন্থী স্কুলে নূতন শিক্ষাব্যবস্থায় ছাত্রদের প্রতি আন্তরিকতার স্পর্শ অনুভব করা যায়। শিক্ষকের স্নেহের স্পর্শে বিদ্যার্থীর দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতির প্রচেষ্টা করা হয়। মনোরোগ-বিদ্‌গণ আরও বলিয়া থাকেন যে, যে সকল গর্হিত অপরাধ শিশুর মধ্যে দেখা দেয় তাহার অধিকাংশের জন্য দায়ী শিশুর অভিভাবকেরা। তাঁহারা শিশুর প্রয়োজনের প্রতি যথাযথ চাহিয়া দেখেন নাই, তাহার মনের সাধ মিটাইতে চেষ্টা করেন নাই।

নিজেকে প্রকাশ করিবার বাসনা আমাদের সকলের মধ্যেই রহিয়াছে। আমরা পরস্পর হইতে বিভিন্ন, তজ্জন্য আমাদের গঠন, বুদ্ধি ও প্রকাশভঙ্গীও বিভিন্ন, শিশু জন্ম হইতেই যে বৈশিষ্ট্য সঙ্গে করিয়া আনে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তাহাই ক্রমে বিকশিত হইয়া উঠে। পরিবেশের বিভিন্নতার জন্যও সময়ে সময়ে এইরূপ ঘটিয়া থাকে। তাহার ইচ্ছা, প্রবৃত্তি, মনোভাব সব বিভিন্ন হইয়া পড়ে। কোনরূপ বাধার সম্মুখীন হইলে সে নূতন পথে কার্যসিদ্ধির উপায় খুঁজিয়া লয়। এইভাবে মানুষ-মাত্রেরই বিশিষ্ট রূপ গড়িয়া উঠে। জানা গিয়াছে যে কর্তব্য-বিমুখতা অথবা উন্মত্ততা প্রভৃতি কোনরূপ চরিত্রের দোষ দেখা দিলে বুঝিতে হইবে যে শিশুর জীবনের আরম্ভে আঘাত বহুদূর পৌঁছিয়াছিল। এমন কি ছোটখাট দীর্ঘস্থায়ী শারীরিক অসুস্থতার মূলেও দেখা যায় শৈশবের অতৃপ্ত চিত্তবৃত্তির হাহাকার বর্তমান ছিল।

নূতনপন্থী স্কুলে শিশুকে নিজের নিজের রুচি ও প্রয়োজনমত আত্মবিকাশের যথেষ্ট সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয়। স্বেচ্ছায় মুক্তভাবে কিছুদূর কাজ করিবার সুযোগ না পাইলে কি শিক্ষক, কি ছাত্র—কেহই নিজের বিশেষ গুণ, দোষ বা দুর্বলতা বুঝিতে পারে না। স্কুলের অবাধ ও স্বচ্ছন্দ পরিবেশ যে শিশুর পরিপূর্ণ আত্মবিকাশের সহায়তা করে, প্রগতিশীল শিক্ষা সে বিষয়ে সচেতন।

শিশুর জীবনের সকল ক্ষেত্রেই নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্ততার

ভাব অত্যন্ত আবশ্যক। কিঞ্চিৎ স্নেহের সুর, কিঞ্চিৎ নিরুদ্বেগের ভাব কিংবা আত্মপ্রত্যয়জনিত সাহস—এই সব যদি শিশু গৃহে অথবা স্কুলে না পায় তবে নানা কু উপায়ে সে তাহা চরিতার্থ করিবার জন্য অগ্রসর হয়। এই শতাব্দীর প্রথম ভাগে এ্যাড্‌লার (Adler) এইরূপ এক হতভাগ্য যুবকের শোচনীয় পরিণাম দেখাইয়াছেন। দেহ খর্বাকৃতি বলিয়া যুবকটির নিজের প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। সকল ক্ষেত্রেই এইরূপ কোন শারীরিক অথবা বাহ্যিক কারণ যে থাকিবে তাহা নহে। "আমাকে কেহ চায় না, কেহ ভালবাসে না" এই ধারণাগুলিও নিজের সম্বন্ধে নিকৃষ্টতা অথবা ভুল ধারণা জাগাইয়া দেয়। এই প্রকার মানসিক অসুস্থতা হইতে আজকাল ছাত্রেরা যাহাতে রক্ষা পায় সেজন্য প্রগতিশীল স্কুলগুলিতে তাহাদের মনের অনুকূল পরিবেশের ব্যবস্থা করা হইতেছে। এই স্কুলগুলিতে ছাত্রদের নানা কাজে, পড়াশুনায় এবং খেলাধূলায় সর্বত্রই উৎসাহ দেওয়া হইয়া থাকে। শিক্ষকের নিকট তাহারা সকলেই সমান, শত অসুবিধার মধ্যেও তিনিই "মুস্কিল আসান"। যাহার যে কাজ করিবার ইচ্ছা শিক্ষক তাহাকে সেই পথেই চালিত করেন। ফলে শিক্ষার্থী নিজেকে হেয় ভাবিতে শেখে না —সেইজন্য "রিপোর্ট কার্ড"এ ছাত্রদের শ্রেণী ভাগ করা বা অন্যায়ভাবে প্রতিযোগিতা বাড়াইবার চেষ্টা বহু স্কুলে আজকাল পরিত্যক্ত হইয়াছে। কেহ গান গাহিতে না পারিলে অথবা খেলাধূলায় তৎপর না হইলে লজ্জা পাইবার কি আছে?

অপরিণত শিশুমনে অক্ষমতার লজ্জা জন্মাইবার অবকাশ দিলে তাহার উপর অন্যায় করা হয়। সাধ্যাতীত কাজ হইতে তাহাকে বিরত করিয়া সাধ্যায়ত্ত কাজ দিলে আনন্দে ও উৎসাহে সে সেই কাজ করিতে পারে।

মানুষ সামাজিক জীব। ক্রিয়াকর্মে, খাওয়া-পরায়, খেলা-ধূলায় ও আমোদপ্রমোদে মানুষ একা তৃপ্তি পায় না। সংসারের সকল কাজ দলবদ্ধ ও সমবেতভাবে করিতে পারিলে যেমন লাভ আছে, তেমনই আছে আনন্দ। মানুষের এই স্বভাব সৃষ্টির আদিতেও যেমন ছিল আজও তেমনই রহিয়াছে। সকল রকম রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্রিয়াকর্ম ও সভাসমিতি গঠনের মূলে রহিয়াছে এই প্রেরণা। মানুষ একা থাকিতে পারে না এবং একা থাকার কোন সার্থকতাও নাই। দল বাঁধিলে যে দলগত বৈষম্য প্রকট হইয়া মানুষকে স্বার্থান্ধ করিয়া তুলিবে তাহার কোন অর্থ নাই। সঙ্কীর্ণতা ও দলাদলি ভুলিয়া বৃহত্তর জনস্বার্থে ব্যক্তিগত ও দলগত স্বার্থকে বিলীন করিয়া দেওয়াই মানুষের কর্তব্য, তবেই মানুষ সমাজের শ্রেষ্ঠ জীব বলিয়া গণ্য হইবে; উপযুক্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের এইদিকে দৃষ্টি রাখা একান্ত বিধেয়। ছাত্রেরা পড়াশুনার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র প্রচলিত রীতি-নীতি ও আচার-ব্যবহার শিখিয়া লয়। ইহাতে একদিকে যেমন সমাজে পাঁচজনের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া সে সপ্রতিভ ও নিপুণ হয়—অন্যদিকে তাহার ব্যক্তিগত সম্ভ্রমবোধ জাগিয়া উঠে। নূতন শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুকে প্রকৃত মানুষ গড়িয়া তুলিবার

প্রয়াস রহিয়াছে, পরস্পরের প্রতি সদ্ভাব ও সহযোগিতা রক্ষা করিয়া বিরাট বিশ্বকে আপন করিয়া লইবার নির্দেশ এই প্রকার আধুনিক শিক্ষায়তনেই পাওয়া যায়। সংস্কৃতিকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে যে প্রাণধারা সমাজকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখে সেই ধারার স্পর্শে ছাত্রেরা প্রাণবন্ত হইয়া উঠে। সংস্কৃতির ধারাকে গ্রহণ করার অর্থ ইহা নহে যে কেবল তাহাকেই আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকিতে হইবে বরং আদানপ্রদানের মধ্য দিয়া পূর্বাগত কৃষ্টির উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে। পুরাতন শিক্ষাব্যবস্থায় এই পুরাতন ঐতিহ্য একই ধারায় প্রবাহিত হইত। নূতন ব্যবস্থায় সেই ধারা রহিয়াছে, তবে তাহা যেন গভীরতর এবং সুন্দরতররূপে শিক্ষার্থীদের চেতনা জাগাইয়া দেয়।

এই লক্ষ্যে পৌঁছিবার উদ্দেশ্যে প্রগতিশীল শিক্ষাকেন্দ্রে অতি চমৎকার ব্যবস্থা রহিয়াছে। স্কুল যেন একটি ছোটখাট সমাজ। এই সমাজে পরস্পরের সম্বন্ধ অতি নিকট-আত্মীয়তার। কি অবস্থায় কি প্রকার জীবনযাত্রা হওয়া উচিত তাহা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া জানিয়া, বুঝিয়া শিখিবার সুযোগ লওয়া যায়। আবার সমাজে যে বয়োবৃদ্ধগণ রহিয়াছেন তাঁহাদের সহিত শিশুদের যোগাযোগ ঘটাইয়া নানা বিষয়ে আলাপ আলোচনার সুযোগ দেওয়া হয়। তাহা ছাড়া নানা উপায়ে, যথা চলচ্চিত্র, রেডিও প্রভৃতি সরঞ্জামাদির সাহায্যে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদান করাও হয়।

মনোবিজ্ঞান দর্শনশাস্ত্রের অংশ মাত্র বলিয়া বহুদিন পর্যন্ত

পৃথক বিজ্ঞান রূপে কোন সমাদর পায় নাই। মাত্র ৯০ বৎসর পূর্বে জার্মানীতে উণ্ড (Wundt) ও ফেক্‌নার (Fechner) এবং মার্কিনদেশে জেম্‌স (James) মানুষের শরীরে মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলী কি ভাবে কাজ করে সেই বিষয়ে সর্বপ্রথম গবেষণা করিয়া মনোবিজ্ঞানকে বৈজ্ঞানিক শাস্ত্ররূপে প্রমাণিত করেন। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া ও মস্তিষ্কের সঙ্গে ইহাদের যোগাযোগ এবং কি করিয়া শারীরিক উত্তেজনা ধীরে ধীরে মনে ভাবের বা চিন্তার উদ্রেক করে এই সকল বিষয় লইয়াই মনোবিজ্ঞানের চর্চা।

মনোবিজ্ঞানের চর্চার ফলে শিক্ষাকে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে যাচাই করিবার অবকাশ হইয়াছে। পূর্বে ধারণা ছিল যে মানুষের মস্তিষ্কে বুঝি-বা ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠ আছে এবং স্মরণশক্তি, বিচারশক্তি, একাগ্রতাবোধ, সৌন্দর্যজ্ঞান প্রভৃতি নানা মানসিক বৃত্তি (faculty) এইরূপ সকল স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠে রাজত্ব করে। আধুনিক মনোবিজ্ঞান পুরাতন সিদ্ধান্তকে উল্টাইয়া দিয়াছে। স্মরণশক্তির কথাই ধরা যাউক। পদ্য মুখস্থ করিতে গেলে বিশেষ নিপুণতার প্রয়োজন, কিন্তু সেই ক্ষমতার জোরে কাহারও চিঠি ডাকে দিবার কথাও মনে থাকিবে তাহা আশা করিতে পারা যায় না। পরিচিত কাহারও নাম শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার চেহারা এবং বেশভূষা চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে, কিন্তু তাই বলিয়া পাঠ্য বিষয়বস্তুও সেই অনুপাতে যে স্মরণ হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই।

আসল কথা এই যে, যে কাজে যাহার বিশেষ আগ্রহ থাকে সেই কাজ মনেপ্রাণে সার্থক করিয়া তুলিতে মানুষ এক স্বাভাবিক প্রেরণায় যত্নবান হয়।

বিচারশক্তিতে তাহাই দেখা যায়। বিজ্ঞানে যে যুক্তি বিচার খাটিয়াছে রাজনীতি বা ধর্মে তাহা কি করিয়া চলিবে? আইনস্টাইনের মত খ্যাতনামা পণ্ডিতকে কেহ রাজ্যপাল নিযুক্ত করার কথা মনেও স্থান দেয় নাই। মূলকথা এই যে কার্য়কারিতার দ্বারা জ্ঞানের মূল্য বিচার করা হয়। শিশু যদি কোন এক বিষয়ে কাঁচা থাকে তবে একেবারে হাল ছাড়িয়া দিতে হইবে এমন কোন কথা নাই, লেখাপড়ায় আগ্রহ না দেখাইয়া খেলায়, ছবি আঁকায়, ফটোগ্রাফিতে যদি কোন ছাত্র বিশেষ আগ্রহ দেখায়—তবে সেই সকল বিষয়েই তাহাকে উৎসাহিত করা দরকার।

প্রাচীনপন্থী বিদ্যালয়গুলিতে এখনও যে জ্যামিতি শিক্ষা পাঠকের বিচারশক্তি বাড়াইবার একমাত্র প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া মনে করা হয়, সেটা ভুল : এই জন্যই বোধ হয় আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতিতে যাহা কিছু অভিজ্ঞতাপ্রসূত তাহারই উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। ফলে ছাত্রেরা যে জ্ঞান লাভ করে তাহাকে পূর্ব অভিজ্ঞতার দ্বারা যাচাই করিয়া স্বীয় জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়া তোলে ; তবে সর্বকালের মধ্যে যে জ্ঞানের গণ্ডি নির্দিষ্ট হয় তাহা নহে। আর প্রগতিশীল শিক্ষার বিশেষত্ব এই যে তাহা যুগপরিবর্তন অনুযায়ী রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে।

শিক্ষণতত্ত্বে (Theory of Learning) মনোবিজ্ঞানের দান উল্লেখযোগ্য। মনে পড়ে আমরা পড়িতে শিখিবার আরম্ভেই কি করিয়া অক্ষর হইতে শব্দে এবং শব্দ হইতে বাক্যে পাড়ি দিতাম। এখন ঠিক তাহার বিপরীত নিয়মে শিখাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দেখা গিয়াছে যে অর্থহীন ছোটখাট শব্দ শিখিবার অপেক্ষা অর্থবহুল কোন বাক্য শিখিতে শিশুর অপেক্ষাকৃত কম সময় লাগে। শিশুরা প্রথমে বাক্যের সাহায্যে শিখিতে আরম্ভ করে, কোন কিছু দেখিবার পর শিশুরা নিজেদের মধ্যে কথা বলিয়া আনন্দ পায়, তাহাদেরই উচ্চারিত কয়েকটি বাক্য শিক্ষক "বোর্ডে" লিখিয়া দিলে শিশুদের তাহা চিনিতে বিশেষ দেরী হয় না। হয়ত "আমরা" শব্দটি কয়েকটি বাক্যে বারবার ব্যবহৃত হইয়াছে: এই রকম আরও শব্দ পাওয়া যাইবে, এই ভাবে তাহাদের উপযোগী একটি শব্দতালিকা শিক্ষক মহাশয় তৈয়ারী করিয়া লইবেন। হয়ত ইহাতে একই ধরণের উচ্চারণবহুল শব্দ থাকিবে, যেমন, 'ফল', 'জল', 'তল', 'বল', অথবা 'কলকল', 'ছলছল', 'টলটল', 'ঢলঢল'—যেখানে অনুপ্রাসের ধ্বনি সহজেই মনকে আকৃষ্ট করে, সুতরাং শিক্ষা-প্রণালীতে ক, খ, গ ইত্যাদি বর্ণের পরিচয় সর্বশেষে স্থান পাইল।

ধারাপাতে নামতা শিখিবার স্থলেও এইরূপ ঘটে। প্রথমে 'যোগ' শিখিতে যাইয়া শিশু হয়ত সাধারণ ২+২+২+২ এর যোগফল বাহির করিল। বহুবার এই রকম করিলে শিশু

নিজেই বুঝিবে যে '২' বার '৪' এবং '৪' বার '২' কি করিয়া হইল, সংখ্যাগুলি এই ভাবে জানিয়া লইলে নামতা লিখিতে কোন অসুবিধায় পড়িতে হয় না।

নবীনপন্থী স্কুলের বিশেষত্ব এই যে ইহা কর্মকেন্দ্রিক, হাতে কলমে করিলে যে কোন জিনিসই সুষ্ঠুভাবে শেখা যায়। সুতরাং এই শিক্ষাপ্রণালীর অভিজ্ঞতালব্ধ পাঠ্যক্রমের (experience curriculum) বিশেষ মূল্য আছে।

আশা করা যায় যে মনোবিজ্ঞানের মূলনীতি শিক্ষাক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইলে শিক্ষাকে বিজ্ঞানসম্মত বলা যাইতে পারে। পরিমাপের (measurement) কাজ মনোবিজ্ঞানের প্রথম বৈশিষ্ট্য। পরীক্ষার প্রথা জগতে বহু আগেই প্রচলিত ছিল, কিন্তু তাহার অসুবিধা যে কত তাহা জানিতে বাকি নাই। ১৯০০ সনে স্টোন (Stone) ও আয়ার্স (Ayres) উদ্ভাবিত প্রামাণিক পরীক্ষা (standardised test) ব্যবহার করিয়া দেখা গিয়াছিল যে ইহা যে কেহ, যে কোন সময়ে, যে কোন স্থানে ব্যবহার করিলে একই ফল পাইবে। ইহা দ্বারা বিভিন্ন স্কুলগুলির পরস্পরের মধ্যে এবং একই স্কুলের বিভিন্ন ছাত্রদের মধ্যেও তুলনা করা সম্ভব হইল।

শিক্ষাবিজ্ঞানে মননপরীক্ষার (intelligence test) মামুলী সূত্রপাত এইভাবে ঘটে। ফরাসীদেশে বিনে (Binet) এবং সাইমন (Simon) নামক দুই মনস্তত্ত্ববিদ্ এই অদ্ভুত আবিষ্কারটি করিলেন, দেখাইলেন যে ছেলেদের বুদ্ধির তারতম্য

বিচার করা অসম্ভব নহে। গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল অপেক্ষাবৃত স্বল্পবুদ্ধি এবং স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন কয়েকটি ছেলে। বুঝিতে বাকী রহিল না যে বিভিন্ন বয়সের ছেলেদের কাজ করিবার শক্তি ও সামর্থ্যে অনেক তারতম্য আছে। উভয়ে মিলিয়া "বিনে সাইমন স্কেল" (Binet Simon scale) বুদ্ধি পরিমাপন উদ্দেশ্যে তৈরী করিয়া ফেলিলেন। এই স্কেল অনুযায়ী বলা হইল যে, যে ছেলে আট বৎসর বয়সের উপযোগী সকল প্রশ্নের উত্তর সঠিক দিবে তাহার মানসিক বয়স (mental age) হইবে আট। এইভাবে ভিন্ন ভিন্ন দৈহিক বয়সের (chronological age) তুলনায় তাহাদের মানসিক বয়স নির্ধারিত হইল।

১৯১৫ সালে প্রফেসার টারমান্ (Terman) স্ট্যানফোর্ড (Stanford) বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্কিন ছেলেমেয়েদের জন্য এই স্কেলের যথাযথ ব্যবহার নির্ধারিত করিলেন। তিনি দেখিলেন যে, যে ছেলের "মানসিক বয়স" দৈহিক বয়সের অনুপাতে কম, স্বভাবতঃই সে ছেলের বুঝিবার ক্ষমতা সমবয়সী ছেলেদের অপেক্ষা কমই থাকিয়া যায়। টারমানের মনে এক অভিনব চিন্তার উদয় হইল। তিনি বলিলেন যে "মানসিক বয়সকে দৈহিক বয়সের অনুপাতে (percentage) বিচার করিতে হইবে।" যথা—

$$\frac{\text{M. A.}}{\text{C. A.}} \times 100 = \text{I. Q.}\ \frac{\text{মানসিক বয়স}}{\text{দৈহিক বয়স}} \times ১০০ = \text{বুদ্ধি অনুপাত।}$$

তিনি প্রমাণ করিলেন যে এই ফলাফল সকল অবস্থায় একই রকম থাকে। ইহাকে টারমান্ (Terman)-এর ইচ্ছানুযায়ী "বুদ্ধি অনুপাত" "Intelligence Quotient" বলা হয়। যদি কোন ছেলের বুদ্ধির অনুপাত "৮০" হয় তবে বুঝিতে হইবে সেই ছেলের মানসিক বয়স দৈহিক বয়সের শতকরা ৮০ ভাগ। আর বুদ্ধির অনুপাত "১২৫" হইলে বুঝিতে হইবে যে মানসিক বয়স দৈহিক বয়সের শতকরা ১২৫, দশ বৎসর বয়সে বুদ্ধির অনুপাত ১২৫ হইলে বুঝিতে হইবে যে ছেলেটির ১২ বৎসর বয়সের ছেলের মত বুদ্ধি হইয়াছে।

এই গবেষণাগুলি দ্বারা শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক সুবিধালাভ হইল। শিক্ষকেরা এক শ্রেণীর সকল ছাত্রদেরই একই মানসিক বয়স বলিয়া ভুল করিতেন। দেখা গেল যে একই শ্রেণীর ছাত্রদের পরস্পরের মধ্যে প্রায় চার বৎসর পার্থক্য ছিল। সুতরাং একই প্রকারের কাজ সকলকে দিলে অত্যন্ত অবিচার করা হইবে, পারস্পরিক প্রভেদ অনুযায়ী শিক্ষাচালনা অত্যন্ত আবশ্যক বুঝা গেল। এই মানসিক বয়সের আবিষ্কারের পরে শিক্ষাবিদ্‌দের মনে এই প্রশ্ন জাগিল যে যাহা কিছু শিখানো হইতেছে সে সকলই ছাত্রদের মানসিক পরিপক্কতা অনুসারে ঠিক সময়ে ঠিকভাবে দেওয়া হইতেছে কিনা। পনর বৎসর ধরিয়া পাঁচশত সহরে বিদ্যালয়সমূহে গবেষণা চলিল যে শিক্ষার্থীর জীবনের কোন্ বয়সে গণিতের বিভিন্ন অংশ আলোচনা করিয়া শিক্ষা দেওয়া সমীচীন

হইবে। দেখা গেল অধিকাংশ স্কুলে উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয় না। হয়ত কোন কঠিন বিষয়ই সহজ বিষয়ের পূর্বে পড়ান হয়। শিশুর মন যখন কোন কিছু শিখিতে বা গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়া উঠে সেই পরম শুভ মুহূর্তে তাহা শিখাইবার মত এমন সুযোগ আর কি আছে? তখন যেমন সহজভাবে সে শেখে তেমনই স্থায়িভাবে সেই বিষয়টি তাহার মনে গাঁথিয়া যায়। এই নিয়ম অনুযায়ী গণিতে ভাগের অঙ্ক তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণীতে শিখানো উচিত বলিয়া বিবেচিত হয়।

এইভাবে শিক্ষার সকল ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির প্রয়োজন অনুভূত হয়। তবে শুধু দৃষ্টি থাকিলেই হয় না—প্রতিটি নূতন ধারার মূল্য যাচাই করিলে তবেই ইহার সার্থকতা বুঝিতে পারা যায়।

বর্তমান চিকিৎসাশাস্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্বেও যেমন রোগীদের সুস্থ করিবার ব্যবস্থা ছিল, সেইরূপ শিক্ষাক্ষেত্রেও বিজ্ঞানসম্মত প্রথার প্রচলন হইবার পূর্বে প্রগতিশীল শিক্ষা প্রচলিত ছিল। সে যুগেও শিক্ষাদাতা এবং শিক্ষার্থীর অপূর্ব অন্তরঙ্গ সম্পর্ক দেখা যাইত। গুরুর বুদ্ধিমত্তা এবং ব্যক্তিত্ব, তাঁহার সহানুভূতি এবং দূরদৃষ্টি, উচ্চ আদর্শ শিক্ষার মূল উৎস ছিল। বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে বিজ্ঞানের দানও ভুলিবার নহে। ভালমন্দ বিচারে দৃষ্টিভঙ্গী, যাহা উৎকৃষ্ট তাহা গ্রহণ করা, এবং লোকসমাজে তাহা প্রচার করা—এই যে কল্যাণসাধন ইহাই শিক্ষাক্ষেত্রে বিজ্ঞানের দান।

তৃতীয় অধ্যায়

বাধ্য প্রজা বা দায়িত্বশীল নাগরিক

১৮০৬ খৃষ্টাব্দে জেনা (Jena) নগর নেপোলিয়নের কবলিত হইবার পর প্রাশিয়া উহার সম্পূর্ণ দায়িত্ব লইবার মনস্থ করিল। ফিচের (Fitche) পরিকল্পনা অনুসারে একদল নূতন শিক্ষক পেস্টলঝির (Pestalozzi, ১৭৪৬-১৮২৭) কাছে উপযুক্ত শিক্ষার আশায় গেল, পেস্টলঝি সে সময়ে পাশ্চাত্যের জনগণের জীবনযাত্রায় কি করিয়া উন্নততর পথের সন্ধান দেওয়া যাইতে পারে তাহাই চিন্তা করিতেছিলেন। প্রাশিয়ার এই নব যুবসঙ্ঘ তাঁহার নিকট শিক্ষালাভ করিয়া নূতন ভাবের উদ্দীপনা লাভ করিল, স্বদেশে ফিরিয়া নূতন ধরনের শিক্ষালয় স্থাপন করিবার জন্য উৎসাহে দল বাঁধিল। শিক্ষাব্রতীরা কি উদ্দেশ্যে কি লিখিতেছে এবং জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে কি ভাবে তাহার প্রয়োগ করিয়া লাভবান হইবে—ইহাই ছিল পেস্টলঝির শিক্ষার প্রথম বাণী। প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী অর্থহীন বিষয়বস্তু নির্বোধের মত আয়ত্ত করিবার চেষ্টা নূতন শিক্ষাধারায় একেবারেই অনুমোদন পাইল না। নূতন ধরনের স্কুল স্থাপিত হইল—বিশেষ করিয়া ফরাসী ও মার্কিন দেশে শিক্ষাক্ষেত্রে এই ঢেউ তুমুল আলোড়ন আনিয়া

দিল, মার্কিন দেশে হোরেস মান (Horace Mann, ১৭৯৬-১৮৫৯) বিশেষভাবে এই নূতন শিক্ষা পদ্ধতির প্রয়োগ করিলেন।

দেখা গেল যে নূতন 'ফোল্‌ক্ স্থ্যলে' (Volkschule) অর্থাৎ ফোক স্কুল প্রতিষ্ঠার ফলে এবং অন্য কতকগুলি কারণ উপস্থিত হওয়ায় ১৮৪৮ খৃঃ অব্দে উদারপন্থীদের মধ্যে এক বিপ্লব আরম্ভ হইল। চতুর্থ ফ্রেডেরিক উইলিয়ম (Frederich William IV) বহু আয়াসে রাজদ্রোহ প্রশমিত করিবার পর প্রথমেই সেই নূতন স্কুলের শিক্ষকদের ডাকিয়া পাঠাইলেন,… …বলিলেন, "আপনারা এবং আপনাদের শিক্ষাব্যবস্থা এই বিপ্লবের জন্য দায়ী, আপনাদের এই মিথ্যা শিক্ষাধারাকে কোনদিনই আমি গ্রহণ করিতে পারিব না।" সুতরাং পুরাতন শিক্ষাব্যবস্থা পুনরায় চালু হইল, লোকের স্বাধীন চিন্তার পথ এই ভাবে বন্ধ হইয়া গেল। ইহার ফলে স্বাধীন চিন্তানীতির অভ্যুদয়ে বাধা পড়িল।

ফ্রেডেরিক উইলিয়মের (Frederich William) এই উক্তির সবটা সত্য বলিয়া না মানিতে চাহিলেও এই কথা স্বীকার করিতে হইবে যে পেস্টলঝির (Pestalozzi) প্রচলিত শিক্ষা সকলের মনে গণতন্ত্রের বাসনা জাগাইয়াছিল। প্রগতিশীল শিক্ষার ফলে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা দৃঢ়তর হইবার সম্ভাবনা দেখা দিল। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় স্বাধীনতার চেয়ে প্রভুত্বের দখল ষোল আনা রহিয়াছে। স্কুলকমিটি অথবা উচ্চপদস্থ

কোন কর্তার ইচ্ছা অনুযায়ী কতকগুলি বই পাঠ্যপুস্তক হিসাবে নির্ধারিত হয়, তাহাদেরই ইচ্ছানুসারে পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রভৃতি নির্দিষ্ট হয় ; অতঃপর শিক্ষক সেইগুলিকে কোন রকমে ছাত্রের গলাধঃকরণ করাইতে চেষ্টা করেন, ছাত্রেরাও সেইগুলিকে তদনুরূপ কণ্ঠস্থ করিয়া শিক্ষককে আশ্বস্ত করিতে চেষ্টা করে। ক্লাসের মধ্যে ফিস্‌ফাস করা, কথা বলা, টিপ্পনী কাটা গর্হিত অপরাধ বলিয়া ধরা হইত। শিক্ষকের সুনাম ও দুর্নাম ছাত্রদের তথাকথিত আচার ব্যবহারের উপরই নির্ভর করিত। বিনা বাক্যব্যয়ে মাষ্টারমশায় নিজেও উপরওয়ালা কর্তাদের আদেশ মানিয়া লইতেন। শৃঙ্খলার মানদণ্ড ছিল কতকগুলি আদেশবাক্য। স্কুলগুলির যেন একমাত্র লক্ষ্য ছিল, কয়েকজন গোবেচারা ও অতি বাধ্য ছেলে তৈরী করা। কিন্তু অনেক সময় বাড়ীতে নূতনপন্থী ও স্কুলে পুরাতনপন্থী মতামতের দোটানায় পড়িয়া ছাত্রদের মহা অসুবিধা হইত, তাহা ছাড়া গণতন্ত্রের সে ধাঁচার মধ্যে না ছিল শক্তি, না ছিল পৌরুষ ; সঙ্কীর্ণতা, অদূরদর্শিতা যেন পদে পদে বাধার সৃষ্টি করিত। কোন সামাজিক, রাজনৈতিক কিংবা অর্থনৈতিক কঠিন সমস্যায় দেশবাসীর যদি চিন্তা করিবার ক্ষমতাই না থাকে, যদি শাসন পরিষদে প্রতিনিধি নির্বাচনে তাহাদের নানারূপ অক্ষমতা ও দুর্বলতা প্রকাশ পায় তবে সেই গণতন্ত্রের কোন মূল্যই থাকে না। এই অবস্থার জন্য দায়ী মূলতঃ দেশের শিক্ষাব্যবস্থা। প্রগতিশীল শিক্ষার প্রচার দ্বারা এই অবস্থার আমূল পরিবর্তনের

আশা দেখা দিল। ছেলেদের জন্য উপযুক্ত অনুকূল আবহাওয়া যদি স্কুলে না সৃষ্টি করা হয় তবে ভবিষ্যৎ জীবনে দায়িত্বশীল নাগরিক হওয়ার আশা দুরাশামাত্র—যদি শিশুদের বিবেচনাশীল নাগরিকে পরিণত করিতে হয়, যদি রাষ্ট্রের সর্বাঙ্গীন উন্নতির দায়িত্ব নাগরিকদিগকেই বহন করিতে হয়, তবে স্কুলের শিক্ষা-পদ্ধতি, কাজকর্ম, সত্যিকারের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অনুসারেই করিতে হইবে। অর্থাৎ স্কুলপরিচালনার পরিকল্পনা ছাত্রদেরই করিতে দেওয়া হউক, পাঠ্যবিষয় ও পাঠ্যক্রম কি রকম হইবে তাহারাই স্থির করুক। স্কুলবাড়ী কাজের উপযোগী এবং মনোরম করিবার উদ্দেশ্যে কি ভাবে তাহা সাজানো উচিত সে দায়িত্বও না হয় তাহাদেরই উপর ন্যস্ত হউক। দলবদ্ধ হইয়া চিন্তা করা, কাজ করা, এবং ইহার ফলভোগ করার আনন্দই গণতন্ত্রের ভিত্তি সুদৃঢ় করে। গণতন্ত্রের আরও একটি বড় লক্ষণ এই যে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত সম্মান রক্ষ এবং সংখ্যালঘুর সম অধিকার স্বীকার করিয়া লওয়া। মার্কিন দেশে প্রতিটি প্রগতিশীল স্কুলে সকল বর্ণ, ধর্ম ও জাতির সমাবেশ আছে, যদিও সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যও ইহাদের মধ্যে রহিয়াছে, কিন্তু একসঙ্গে কাজ করার সুযোগে তাহারা বুঝিতে পারে সমবেত প্রচেষ্টার মূল্য কত বড়। মতামতের মিল না থাকিলেও বৈরভাব তাহাদের মনে কম জাগে। একে অপরকে শুধু সহ্য করা নহে, গ্রহণ করাতেও তাহাদের আনন্দ হয়। স্বভাবত মানুষের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক রহিয়াছে এবং বৃহত্তর জনস্বার্থের

কল্যাণে ব্যক্তিগত সুখসুবিধা বলি দিবার যে স্পৃহা বা প্রেরণা তাহা প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থাতেই সম্ভব হয়।

গণতন্ত্র বলিতে কেবল এক রকম শাসনতন্ত্রই বুঝায় না, সহযোগিতার নীতিতে সমাজের পুনর্গঠন, হিংসাদ্বেষের অবসান, ভালবাসার বন্ধন বিস্তার—ইহাই প্রকৃত গণতন্ত্রের নীতি। জাতি ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে শিক্ষার্থীকে প্রকৃত মর্যাদা এবং চরিত্র গঠনের সুযোগ দেওয়া এবং জীবনের প্রতি এক স্বাস্থ্যকর দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টি করা, পুরাতন শিক্ষাব্যবস্থায় এ সকল সম্ভব ছিল না। একনায়কত্বের অধীনতা নীরবে স্বীকার করা নূতন শিক্ষার নীতিবিরুদ্ধ। নিষ্ক্রিয়ভাবে আজ্ঞাকারী হওয়ারও এই ক্ষেত্রে কোন প্রশ্ন ওঠে না। সহযোগিতার দ্বারা জীবনে কর্ম ও অগ্রগতির পথ তৈরী করাই ইহার মূল নীতি।

গণতন্ত্রের আর একটি কাজ হইতেছে জনসাধারণকে জীবনের প্রয়োজন অনুরূপ চিন্তাশীল ও বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন করা। কোন প্রচলিত অবস্থার পরিবর্তন, কোন নূতন নীতির প্রবর্তন এবং কোন নীতিকে গ্রহণ করিবার সময়ে চিন্তা ও যুক্তিবিচারের বিশেষ প্রয়োজন। ছাত্রছাত্রীদের সকল বিষয়ে চিন্তা করার অভ্যাস গড়িয়া তোলা স্কুলেরই একমাত্র দায়িত্ব।

স্কুলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শিশুরা অন্যদের সাহচর্যে জ্ঞান লাভ করিতে আরম্ভ করে। প্রথমে নিকটতম সাথীর ভাবভঙ্গী, চলনবলন হইতে এই শিক্ষা আরম্ভ হয়! ক্রমশঃ শিশু যেমন দেশবিদেশের অধিবাসীদের আচারব্যবহার রীতিনীতি জানিতে

উৎসুক হইয়া উঠে তেমনি নানান উপায়ে ঘরে ও বাহিরে, রেডিও ও সংবাদপত্র প্রভৃতির সাহায্যে সকল রকম অবস্থা ও সমস্যা সম্বন্ধে চিন্তা করিতে শেখে, এই ধারা অনুসারে ইতিহাস ও ভূগোল শিক্ষারও যথেষ্ট সহায়তা হয়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে নূতন শিক্ষাব্যবস্থায় স্বাধীন চিন্তা ও আলোচনার যথেষ্ট সুযোগ রহিয়াছে। কার্লটন ওয়াশবার্ন তাঁহার এই পুস্তকে অভিজ্ঞতার সুন্দর একটি বর্ণনা দিয়াছেন। তিনি তখন কোন একটি স্কুলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন, একবার জুনিয়ার স্কুলে (Junior school) একই সপ্তাহে সমাজশাস্ত্র, শিক্ষা ও বিজ্ঞানশাস্ত্রের শিক্ষকের বিরুদ্ধে দুইটি নালিশ আসে। সমাজশাস্ত্রের শিক্ষকের বিরুদ্ধে সিকাগোর (Chicago) এক বৃহৎ ব্যাঙ্কের কোন উচ্চপদস্থ কর্মচারী অভিযোগ করেন যে "স্কুলে তাঁহার ছেলেকে এমন সব বিষয় শেখানো হইতেছে যাহাতে ছেলেদের মাথা খাওয়া হয়।" আসল কথা, একদিন তাঁহার ছেলে মার্কিন শ্রমিক সঙ্ঘের খুব সুখ্যাতি করিতে থাকে। এইরূপ সুখ্যাতি করা সেই পরিবারের নিকট খুব নীতিবিরুদ্ধ ও গর্হিত বলিয়া গণ্য করা হইত। সেই বংশের পূর্বপুরুষেরা সকলেই এই শ্রমিক সঙ্ঘের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া গিয়াছেন। ছেলে বংশের এই মতের বিরুদ্ধে যাইবে অথবা স্বাধীন মতামত পোষণ করিবে—ইহা তাঁহার একেবারেই ইচ্ছা নহে। 'আন্তর্জাতিক মহিলা সমিতি'র প্রতিষ্ঠাত্রীর অভিযোগটি ঠিক ইহার বিপরীত ছিল।

হঠাৎ একদিন তিনি সচেতন হইলেন যে তাঁহার মেয়ে ধনতান্ত্রিক মতের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছে। শিক্ষার্থী ছেলেটি ও মেয়েটি কিন্তু সহপাঠী ছিল, সুতরাং ওয়াশবার্ন তাঁহাদের বুঝাইলেন যে বাড়ীতে তাহাদিগকে সমাজের আংশিক চিত্রই শুধু দেখানো হইয়াছিল। স্কুলের ক্লাশে শিক্ষকের সহায়তায় এবং স্বাধীন চিন্তা ও যুক্তির ফলে তাহারা স্বাধীন মতামত তৈরী করিবার সুযোগ পাইয়াছে। স্কুলের যে উদ্দেশ্য অর্থাৎ স্বাধীন চিন্তার উৎসাহ বৃদ্ধি করা—স্কুলে তাহারই সুযোগ দেওয়া হইতেছে। সুষ্ঠুভাবে নাগরিক কর্তব্য সম্পন্ন করিতে হইলে এই স্বাধীন চিন্তাশক্তির বিশেষ প্রয়োজন।

১৯২৭ সনে রুশিয়াতে প্রাচীনপন্থী ও প্রগতিশীল শিক্ষার এক অদ্ভুত মিশ্রণ প্রচলিত ছিল। স্কুলের শৃঙ্খলা, আভ্যন্তরীণ সকল বন্দোবস্ত এবং বিশেষ করিয়া পাঠ্য বিষয় নির্ধারণ করার ব্যাপারে স্কুলগুলি পরিপূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক ছিল। অথচ 'কম্যুনিজম' বা সাম্যবাদের বার্তা পুস্তকের পাতায় পাতায় স্থান পাইল—সকল কাজে প্লাবন আনিল ঐ মন্ত্র।

১৯৩০ সনের মাঝামাঝি বুঝা গেল যে আর দোটানায় চলিতেছে না, বিভিন্ন চিন্তাধারা এ রকম স্বাধীনভাবে আয়ত্ত করিতে দিলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সাম্যবাদের বিরুদ্ধে মাথাঝাড়া দিবার সাহস উসকাইয়া দেওয়া হয়। সুতরাং শিক্ষানীতির আমূল পরিবর্তন হইল, দেশের মন্ত্রে অর্থাৎ "কম্যুনিজমের" মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া স্বাধীন চিন্তার মূলে কুঠারাঘাত করা হইল।

"সব বুঝি বা গেল"—এই ভয়ে স্কুলে গণতান্ত্রিক ভাব বিসর্জন দেওয়া হইল। স্কুল হইল সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের ও সাম্যবাদের দাস। রাষ্ট্রের বাণীই জনগণের মন্ত্র হইতে হইবে। আজও রুশিয়াতে এই প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে, রাষ্ট্রকেই তাহারা অসীম শক্তির আধার বলিয়া মানিয়া লইয়াছে।

মুসোলিনি (Mussolini) প্রথম হইতেই সাবধান হইলেন। জেন্টাইলকে (Gentile) শিক্ষামন্ত্রী করিলেন, ইহাতে গণতন্ত্রের মূল উৎপাটিত হইল। স্বাধীন চিন্তার দ্বার অবরুদ্ধ হইল, কঠোর নিয়মানুবর্তিতা শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া ঘোষিত হইল। হিট্‌লার (Hitler) ঠিক এইরূপ ব্যবস্থাই প্রবর্তন করিলেন, উইমার প্রজাতন্ত্রের (Weimer Republic) শিক্ষাব্যবস্থা কোনও মতেই তাঁহার সহ্য হইল না। রাষ্ট্রের নাৎসীবাদ দেশের ও দশের ধর্ম হইল—ইহার অন্যথায় কাজ চলিবে না।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানে নূতন শিক্ষা সঙ্ঘ (New Education Fellowship) স্থাপিত হইল। জগতের বিভিন্ন দেশে ইহার প্রচার হইল, লোকার্নো (Locarno)-তে ১৯২৭ সনের সভায় ৫২টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি যোগদান করিলেও ইহাতে রুশিয়া বা ইতালী প্রতিনিধি পাঠাইল না। হিট্‌লারের হাতে ক্ষমতা আসার সময় হইতেই জার্মানীর প্রতিনিধিত্ব বন্ধ হইয়া গেল, এবং এখন সেইখানে এই প্রতিষ্ঠানের মৃত্যুই ঘটিয়াছে।

একনায়কত্ব স্বেচ্ছাতন্ত্রেরই রূপ। স্নুতরাং একনায়ক-প্রধান

রাষ্ট্রের শিক্ষানীতি কখনই গণতান্ত্রিক হইতে পারে না। একমাত্র প্রগতিশীল শিক্ষা যথার্থ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করিতে পারে।

চতুর্থ অধ্যায়

বিনয়

প্রতিদিনের কাজে মানুষকে অনেক সময়েই কোন কর্তৃপক্ষ বা অভিভাবকের নির্দেশমত কাজ করিতে হয়। তথাপি আমরা স্বীয় ইচ্ছার দ্বারাই অধিক ক্ষেত্রে চালিত হই, তাহা ছাড়া, বন্ধুবান্ধব, প্রিয়-পরিজনের কাজও বিনা আদেশে বা বিনা অনুমতিতেই করিয়া থাকি, কারণ সে সকল কাজে আনন্দ আছে, আছে তৃপ্তি। এমন কি যে কাজ অন্যের জন্য বা অন্য সময়ে করিতে ইচ্ছা হয় না, নিজের প্রয়োজনে তাহাও করিতে দ্বিধা বোধ হয় না। সুতরাং বেশ দেখা যায় যে মানুষ কতখানি নিজের অনুশাসন মানিয়া চলে। ইহাতে সকল ক্ষেত্রেই যে সুখপ্রাপ্তি ঘটে তাহা নহে, বিপরীত ফলও হইয়া থাকে। প্রগতিশীল স্কুলে আত্ম-অনুশাসনের চরম ও পরম শিক্ষা দেওয়া হয়। জীবনে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছিতে হইলে অনুশাসনের বড়ই প্রয়োজন। কর্তৃপক্ষের শাসনও সময়ে সময়ে বড়ই প্রয়োজন হয়।

ওয়াশবার্ন একদিনের অভিজ্ঞতার বিষয়ে এক সুন্দর গল্প লিখিয়াছেন—

একদিন তিনটি ছাত্র—প্রতিনিধি দল রূপে তাঁহার কাছে

তাহাদের এক অভিযোগ লইয়া আসিল। প্রিন্সিপ্যালের মারফৎ স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট আসিবার বিলম্ব তাহাদের সহে নাই। ঘরে ঝড় বহিয়া গেল ঃ

—মিঃ বি গণতন্ত্রী নন বলেই মনে হয়।

—কেন, কি ব্যাপার? কি হয়েছে?

—আজ ক্লাশে সকলে একমত হয়ে একবাক্যে কালকের জন্য ছুটি চাইল, তিনি সম্মত হলেন না।

—আচ্ছা, মিঃ বি—তোমাদের মাস্টার মহাশয় তো? তিনি কি করে মাস্টার মহাশয় হলেন?

—আপনিই তাঁকে নিযুক্ত করেছেন।

—আর আমি কি করে স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হলাম?

—স্কুলবোর্ড আপনাকে নিযুক্ত করেছে।

—আর স্কুলবোর্ড কি ভাবে গঠিত হল?

—সদস্যেরা নির্বাচিত হয়েছেন, উত্তর আসিল।

—কাজটা কি গণতান্ত্রিক মতে হয়েছিল?

—হাঁ, তাই তো মনে হয়।

—আচ্ছা দেখ, আমাদের দেশের নিয়ম হচ্ছে যে ষোল বৎসরের নীচে ছেলেদের স্কুলে পাঠাভ্যাস করতে হবে—এই নিয়ম কে করেছিল?

—আইনসভা।

—আইনসভা কে গড়েছে?

—কেন? তাও নির্বাচনে ঠিক হয়েছে।

—ঠিক, তবে আইনসভা যে গণতান্ত্রিক সে বিষয়ে তোমাদের সন্দেহ নেই আশা করি। তবে যখন জনসাধারণের করা কোন একটা আইনমতে স্কুল বোর্ড নির্বাচিত হয়, তখন কোন শিক্ষক যদি সেই বোর্ডের আইন মেনে কাজ করে তবে কি তিনি গণতন্ত্রের বিরোধিতা করেছেন বলবে ?

—না, না···না—তা নয়—

—তোমাদের বয়স কত ?

—চোদ্দ, পনের, পনের······

—তোমাদের মধ্যে কেউ মটর গাড়ি চালাতে পার ?

—পারি, বলিল একজন।

—বেশ। মনে কর তুমি এবং তোমার চারজন বন্ধু একসঙ্গে গাড়িতে যাচ্ছ। ট্র্যাফিক পুলিশ তোমাদের গাড়ি থামাতে ইসারা করল। সবাই একমত হয়ে ঠিক করলে যে ইসারা অমান্য করে গাড়ি চালিয়ে যাবে। করতে পার কি ? ছেলেরা হাসিয়া উঠিল। কথার তাৎপর্য বুঝিয়া তাহারা তখনই ক্লাশে চলিয়া গেল।

প্রগতিশীল শিক্ষায় আত্ম-শাসনের সার্থকতা পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি হয়। ছেলেরা গুরুজনদের শ্রদ্ধা করিতে তখনই শেখে যখন তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধা দেখান হয়। কর্তৃপক্ষকে তাহারা মানিবে না কেন ? পারস্পরিক সহায়তায় তাহারা কাজে আনন্দ পায়। মাস্টার মহাশয়ের হুকুমের অবসর কোথায় ? মাস্টার মহাশয় সর্বদাই তাহাদের সাহায্য করিবার

জন্য প্রস্তুত থাকেন। শিক্ষার্থীদের কুণ্ঠা বা সঙ্কোচের কোন অবসর হয় না। ক্লাশে হয়ত একটু বেশী চাঞ্চল্য বা গোলমাল হইতেছে। ছেলেরা নিজেরাই ইহা যে অন্যায় ও ক্ষতিকর তাহা বুঝিতে পারিবে। তাহাদের শিক্ষা ভাল ও মন্দ উভয়রূপ অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই হওয়া উচিত।

মার্কিনদেশে কোনও স্কুলে এক শিক্ষয়িত্রী অসুস্থতার দরুন একদিন অনুপস্থিত ছিলেন, তিনি স্কুলআফিসে খবর পাঠাইলেও প্রিন্সিপ্যালের কাছে খবরটি পৌঁছাইল না। ছেলেরা সেই ঘণ্টায় তাহাদের শিক্ষয়িত্রীকে না দেখিয়া নিজেরাই কাজ করিতে লাগিয়া গেল। স্কুলে কেহই, এমন কি প্রিন্সিপ্যাল বা অন্যান্য শিক্ষক এবং স্কুলপরিদর্শকগণ জানিতেও পারিলেন না যে নিঃশব্দে সকল দায়িত্ব হাতে লইয়া ছেলেরা নিজেদের কাজ করিতেছে। পরের দিন শিক্ষয়িত্রী আসিয়া ছাত্রদের এই আত্মনির্ভরতা দেখিয়া অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন।

অনুশাসন বলিতে আত্মসংযমও বুঝায়। কর্তৃপক্ষের অন্যায় হুকুমের দাসত্ব করা অথবা বাধ্যতামূলক শাসনের সামনে মাথা নত করাতেও লজ্জা আছে। কিন্তু অন্যায়ভাবে কর্তৃপক্ষের বিরোধিতার অপরাধও অমার্জনীয়।

মনস্তত্ত্ববিদ্‌দের মতে শিশুর অন্তর্নিহিত শক্তির সম্পূর্ণ বিকাশ লাভের ক্ষমতার একটা বিশেষ মূল্য আছে। আমাদের ব্যক্তিগত প্রয়োজন বিভিন্ন। কার্যে দক্ষতা, চরিত্রের গঠন, মানসিক শক্তি ইত্যাদিতে প্রত্যেক মানুষ পৃথক। কিন্তু এই

প্রকৃতিগত বৈষম্যের উপরই মূলতঃ নির্ভর করে বৃহৎ মানব-জাতির উন্নতি। প্রাচীনপন্থীর মতে এই ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের কোন মূল্য নাই। না আছে মূল্য তাহার মৌলিক সৃজন-শীলতার। একই বিষয়কে একই ভাবে সকল ছাত্র পড়িয়া যাইতেছে—না আছে তাহাতে নূতনত্ব, না আছে আবিষ্কারের আনন্দ বা গৌরব। অথচ প্রগতিশীল শিক্ষায় প্রত্যেক ছাত্রকে অপর্যাপ্ত সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয়, যেন তাহার ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গসুন্দর পূর্ণতালাভ সম্ভব হয়। পরিবেশ যত মুক্ত হয় শিশু তত নিজে নিজেই দায়িত্বশীল হইয়া বাড়িতে থাকে।

পঞ্চম অধ্যায়

চরিত্র, নীতি ও ধর্ম

সামাজিকতার উন্মেষ শিশুদের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। একবার চ— তাহার বাবার সঙ্গে ঠাকুরমার কাছে যায়, সেখানে গাছে ফুল দেখা মাত্রই সে আনন্দে নাচিতে থাকে। বলে, "গ—এর জন্য নিয়ে যাব।" বাড়ি ফিরিবার সময় এক ভদ্রলোক তাহাদের বাড়িতে অতিথি হইলেন। চ—কে তাঁহার বড় ভাল লাগিল। চলিয়া যাইবার সময় তিনি একটা বড় বাক্স-ভর্তি "টফি" তাহার হাতে তুলিয়া দিলেন, তখন প্রতিদিন চ—সেই বাক্স খুলিয়া একবার ভাল করিয়া দেখিত—একটু এদিক সেদিক খুঁটিয়া খাইত—আবার বাক্স বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিত। তাহার ইচ্ছা বাড়ি ফিরিয়া গ—কে সেই টফি দিবে। দেখা গেল বাড়ি না পৌঁছান পর্যন্ত চ—সেই টফিগুলি অতি যত্নের সহিত আড়াল করিয়া রাখিয়াছে। তারপর গ—এর সঙ্গে বসিয়া সে যখন "টফি"গুলি সাবাড় করিতে লাগিল তখন চোখেমুখে তাহার সে কি অপূর্ব তৃপ্তির হাসি! সেই পাঁচ বৎসর বয়সেই বন্ধুকে দিয়াই ছেলেটির সুখ; বন্ধুর সহিত আনন্দে তাহার আনন্দ উপলব্ধি হইল, তাহা ছাড়া ব্যক্তিগত আনন্দের তুলনায় এই সামাজিক আনন্দও অধিক বাঞ্ছনীয়

বলিয়া তাহার বোধ হইল। বন্ধুর আনন্দের অংশী হইয়াই তাহার অধিক তৃপ্তি।

প্রগতিশীল শিক্ষায় চরিত্রগঠনের যথেষ্ট সুযোগ আছে। ছেলেরা যাহা শেখে তাহা গভীর মনোনিবেশের সহিত শেখে, ইহাতে পায় তাহারা আনন্দ ও উৎসাহ। বাড়ে তাহাদের আত্মপ্রত্যয়। নিজের পায়ে দাঁড়াইবার নির্ভীকতা না থাকিলে জীবনের ঘাতপ্রতিঘাতে তাহারা অবিচলিত কি করিয়া থাকিবে? হয়ত পদে পদে ভুল করিতেছে কিন্তু সাফল্যের আশায় নূতন উৎসাহে অধ্যবসায়ের দ্বারাই নূতন পথের সন্ধান পাইতেছে। ইহাতে ছাত্রেরা স্বভাবতঃই দূরদর্শী ও সহনশীল হয়। শিক্ষকের উপদেশ ও প্রেরণা হয় তাহাদের পাথেয়।

সামাজিকতা বলিতে সাধারণভাবে আমরা এই বুঝি যে পরস্পরের মধ্যে মেলামেশা করিয়া সদ্ভাব ও সম্প্রীতির মধুর সম্পর্ক স্থাপন করা। কাহারও সঙ্কীর্ণতা যেন অন্যকে আঘাত না দেয়। এই উদার মনোভাব আবহমান কাল হইতে মানুষের মধ্যে বিদ্যমান, তবে বিভিন্ন সমাজে ও দেশে ইহার তারতম্য দেখা যায়। যে সমাজে ইহা অধিক মাত্রায় অনুভূত হয় বুঝিতে হইবে সেইখানেই মানুষের প্রকৃত কল্যাণ বিরাজ করে।

আবার সামাজিকতাবোধের সৃষ্টি একমাত্র সহযোগিতার দ্বারাই সম্ভব। সমবেত চিন্তন ও কর্ম যেরূপ বাঞ্ছনীয় সেইরূপ ঐগুলি চরিত্রগঠনেরও সহায়ক। যেখানে সঙ্কীর্ণতা, সেখানেই

পরস্পরের বিরোধ, দলাদলি ও হানাহানি। সমাজে ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থের বশে স্বার্থগোষ্ঠী, ধর্মগোষ্ঠী, জাতিগোষ্ঠী, ভাষাগোষ্ঠী ইত্যাদি সকল রকম গোষ্ঠীভাবই দেখা যায়। যখন দলগত স্বার্থকে বৃহত্তর স্বার্থে ডুবাইয়া দেওয়া যায় তখন শান্তি ও উন্নতি এই দুইটি সম্ভব হয়। প্রথমেই পরিবারের প্রতি আনুগত্য সকলেই স্বীকার করে, তবে পরিবারের ও সমাজের স্বার্থে দ্বন্দ্ব না বাধিলেই হইল। দশের কল্যাণের জন্য ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জন দেওয়া অসম্ভব নহে, আবার দশের দাবী মানিতে গিয়া দেশের দাবী অগ্রাহ্য করা, তাহাও সমীচীন নহে, এই ভাবে মানুষের আনুগত্যের গণ্ডি ক্রমশঃ বিস্তৃত হয়। পরিবার হইতে গোষ্ঠী, গোষ্ঠী হইতে দেশ, ক্রমে দেশ, দেশান্তর অতিক্রম করিয়া সমগ্র বিশ্বজগতে পরিব্যাপ্ত হয়। যেদিন বিশ্বসমাজের কল্পনা বাস্তবে পরিণত হইবে, যেদিন বিশ্বের দুয়ারে আত্মস্বার্থের বলিদান হইবে—সর্বকল্যাণ সাধিত হইতে সেদিন আর বিলম্ব হইবে না। এ শুধু সারগর্ভ নীতিবাক্য নহে ; এই নীতি কার্যকরী না হইলে দ্বন্দ্ব অনিবার্য। প্রগতিশীল স্কুলে ব্যক্তিকে উপযুক্ত মর্যাদা দিয়া, পরস্পরের সহিত সদ্ভাবে থাকিয়া কিভাবে সমাজের কল্যাণসাধন করা যাইতে পারে এই সকল বিষয় বুঝাইবার প্রচেষ্টা করা হয়।

মানুষ পরস্পরের প্রতি কত নির্ভরশীল অল্প বয়স হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। কিন্‌ডারগার্টেনের ছোট শিশুদের কোন কার্য বা কারখানা পরিদর্শনের দ্বারা সহজেই এই জ্ঞান

দেওয়া যাইতে পারে যে কোন্ প্রয়োজনীয় জিনিস আমরা কি পদ্ধতিতে বা কিভাবে পাইয়া থাকি। আমাদের খাওয়া, পরা, থাকা, শোওয়া, যাহা কিছু হইতেছে সকলের পিছনেই এইরূপ নির্ভরশীলতার ইঙ্গিত রহিয়াছে।

প্রগতিশীল স্কুলের শিক্ষকেরা পরস্পরনির্ভরতা শিক্ষাদানের এই সুযোগ ছাড়েন না, প্রত্যেক ছাত্রকে এ বিষয়ে সজাগ করিয়া দেন যে জগতের কল্যাণে আমাদের কল্যাণ এবং আমাদের মঙ্গলে জগতের মঙ্গল। সমস্ত ধাতু সমস্ত খনিজ পদার্থ অথবা যাহা কিছু দৈনন্দিন ব্যবহার্য বস্তু আমাদের প্রয়োজন হয় অথবা কলকারখানায় যে সকল যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয় তাহা সবই পৃথিবীর দেশ-দেশান্তর হইতে আনিয়া একত্র করা হয়। অতএব কোন না কোন প্রকারে, কোন না কোন ব্যাপারে সমগ্র জগৎকে জড়াইয়া ফেলা হইয়াছে। এক পেয়ালা চা কিংবা কফি আমাদিগকে কত লোক, কত যানবাহন, কত ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। আমাদেরই প্রাতরাশের জন্য হয়ত কত শত লোকের সহায়তার প্রয়োজন হইতেছে।

নূতন শিক্ষাব্যবস্থায় সঙ্ঘবদ্ধভাবে সমবেত প্রযত্নে কিভাবে কাজ করা যায়—তাহাই শিক্ষা দেওয়া হয়। কোথায় ব্যাঙ্ক, কোথায় স্টোর, কোথায় মিল, কোথায় ফ্যাক্টরী সবই একে একে তাহাদের চোখের সামনে আসিয়া যায়। চিত্তবিনোদনের জন্য কিরকম আমোদপ্রমোদ হইতে পারে, কোন্ কর্মসূচীতে

কলানৈপুণ্যের লক্ষণ কিভাবে যুক্ত করিয়া দেওয়া হইবে—কোন্‌টিতে স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবে এই সকল ক্ষেত্রই পারস্পরিক সংযোগের ও সহায়তার নিদর্শনরূপে প্রয়োগ করা হয়। নূতন শিক্ষায় সমাজশাস্ত্র এবং সাহিত্যের বিশেষ স্থান আছে, সামাজিক শিক্ষা বলিতে ইতিহাস, ভূগোল, রাজনীতি, অর্থনীতি—একসঙ্গে মিলাইয়া যে শাস্ত্র—তাহাকেই বুঝায়। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীকে যখন বাংলাদেশের ভূগোল এবং ইতিহাস পড়িতে বলা হয় তখন এই দুইয়ের কি সম্পর্ক তাহার বিচার করা হয় না। সমাজশাস্ত্রে এক বিষয়ের সঙ্গে অন্য বিষয়ের কি সম্বন্ধ তাহার উপর দৃষ্টি রাখিয়া ছাত্রকে পাঠাভ্যাস করিতে বলা হয়।

পূর্বকালে কিভাবে জীবনযাপন করা হইত এবং এখন কিভাবে করা হয়, সমাজে বংশপরম্পরার ধারাবাহিক যে ইতিহাস তাহা ছাত্রদের সামনে তুলিয়া ধরা একমাত্র সমাজ-শাস্ত্রের সাহায্যেই হয় এবং বিদ্যাশিক্ষার প্রশস্ত প্রাঙ্গণেই তাহা সম্ভব। বাস্তবের স্পর্শে এই শিক্ষাশাস্ত্রকে ছাত্রদের সম্মুখে উপস্থিত করিলে সমাজে পারস্পরিক নির্ভরতার সার্থকতা বুঝিতে তাহাদের বিলম্ব হয় না। এইরূপে একদিকে গণতান্ত্রিক কার্যক্রমের মধ্য দিয়া অন্যদিকে ভ্রমণ ইত্যাদির সাহায্যে দৃশ্যবস্তুর প্রতিকৃতি প্রত্যক্ষ করাইয়া ছেলেদের সামাজিক মনোভাবের উৎকর্ষ-সাধনের প্রচেষ্টা করা হয়। চরিত্রগঠনের ইহা একটি প্রধান দিক।

মানুষের যখন এই চেতনা জাগরিত হয় যে তাহার উন্নতি অপরের উন্নতির সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত রহিয়াছে—স্বভাবতঃই তখন সে তাহার ভবিষ্যতের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা অপরের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে মিলিবার এবং মিলাইবার প্রয়াস করে। ইহাকে বলা হয় দূরদর্শিতা। প্রগতিশীল স্কুলের প্রধান উদ্দেশ্য চরিত্রগঠন। মানসিক স্বাস্থ্য অটুট রাখিবার জন্য মনোবিজ্ঞানের কল্যাণে আমরা যাহা জানিয়াছি তাহা এই যে, শিক্ষার্থীর আত্মবিশ্বাস ও নিরাপত্তার আশ্বাস অক্ষুণ্ণ রাখা এবং আত্ম-প্রকাশের নৈপুণ্য আয়ত্ত করা—সর্বপ্রথমেই প্রয়োজন। আবার শিশুর দায়িত্বশীলতা, আজ্ঞানুবর্তিতা, স্বাধীনতাপ্রিয়তা প্রভৃতি গুণ—যাহা গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় অত্যন্ত প্রয়োজন, সেগুলির প্রতিও যথেষ্ট দৃষ্টি রাখা হয়। শিশুর চারিত্রিক ও মানসিক উৎকর্ষ এবং তাহার সামাজিক বোধকে কেন্দ্র করিয়াই নূতন শিক্ষার সৃষ্টি।

নীতি বলিতে আমরা কি বুঝি? বিভিন্ন সামাজিক দল, বিভিন্ন সংস্কৃতি ও বিভিন্ন জাতি এক সঙ্গে বসবাস করিবার উদ্দেশ্যে যে সকল নিয়ম ও উপায় গ্রহণ করিয়া লয় তাহাকে নীতি বলা যাইতে পারে। নীতির জাতিগত, দেশগত ও সংস্কৃতিগত পার্থক্য আছে। একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশে বা একই স্থানে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নীতির ধারা বদলাইয়া যায়। যেমন আমাদের দেশে পিতৃপিতামহের আমলে পাঠ্যাবস্থায় গান শেখা "ছেলে নষ্ট" করার সমান বলিয়া ধরা হইত। আর

এখন গান গাওয়ার ক্ষমতাকে কত বড় যোগ্যতারূপে বাল্যকাল হইতেই মানিয়া লওয়া হয়। ওয়াশবার্ন যখন উইনেট্‌কাতে (Winnetka) সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন তখন সেখানে শিক্ষয়িত্রীদের ধূমপান গর্হিত কাজ বলিয়া বিবেচিত হইত, এখন তাহা ব্যক্তিগত ইচ্ছার উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, নীতির বাধা নাই।

দেশকালপাত্রভেদে নীতির তারতম্য হইতে পারে, কিন্তু চরিত্রবত্তার আদর্শ ঠিকই থাকে। তথাপি নীতিশিক্ষার একটা গুরুত্ব আছে। বর্তমান নীতির নিয়ম কি এবং কিভাবে ইহার সহিত মানাইয়া চলিতে হয় ইহা বিশেষ শিক্ষার বিষয়।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রাচীনপন্থী স্কুলগুলিতে কঠোরভাবে নীতিশিক্ষা দেওয়া হইত। অনুশাসনের দ্বারা নীতিশিক্ষা দেওয়া হইত। "সততাই জীবনের চরম লক্ষ্য" ইত্যাদি বিষয়ক প্রবাদ মুখস্থ করিতে হইত। প্রতি গল্প বা কথার শেষে নীতির বুলি আওড়ান হইত। কিন্তু তাহার সত্যিকার সার্থকতা কি তাহা বুঝাইবার কোন চেষ্টা হইত না।

আজকাল প্রগতিশীল স্কুলেও নীতিশিক্ষার একটা প্রাধান্য আছে। কতকগুলি জিনিস করা হয় না বা করা যায় না—ছেলেরা ইহা প্রথমেই বুঝিতে শেখে। তবে সেগুলি যে মানিয়াই লইতে হইবে এমন নহে, শিক্ষকের সাহায্যে তাহারা প্রত্যেক নীতিগ্রহণের যে একটি হেতু রহিয়াছে তাহা বুঝিতে চেষ্টা করে। সুতরাং নীতিশিক্ষা যে একটি স্বতন্ত্র বিষয় হইতে

হইবে এমন কোন কথা নাই—বরঞ্চ সুশিক্ষার ফলস্বরূপ নীতিবোধ আপনা হইতেই ছেলেদের মনে জাগিবে ইহাই আশা করা যায়। আমরা যে সমাজে বাস করি সে সমাজে অপরের ইচ্ছা বা স্বার্থের প্রতি উদাসীন থাকিয়া বাস করিতে পারি না, আবার অন্যের সম্বন্ধে চিন্তা করা এবং অন্যের সহিত নিজের উন্নতি জড়িত এই দূরদৃষ্টি লাভ হইলে নৈতিক শিক্ষার মূল দৃঢ় হইয়া যায়।

পুরাতনপন্থী ও নূতনপন্থী শিক্ষাপদ্ধতির বৈষম্য ধর্মশিক্ষা দেওয়ার উপর নির্ভর করে না। আমেরিকার নূতন বা পুরাতন কোন সরকারী স্কুলে ধর্মশিক্ষা চলিতে পারে না, কারণ সেই বিদ্যালয়গুলি ধর্মনিরপেক্ষ। কিন্তু সাধারণতঃ আমাদের চিন্তা-ধারায় চরিত্র এবং নীতি এই দুইটির ধর্মের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ দেখা যায়।

দেখা যাক, ধর্মশিক্ষার ব্যাপারে আমাদের পরিবার ও আমাদের ধর্মমন্দিরের দান কতখানি এবং ধর্মশিক্ষা বলিতে আমরা কি বুঝি ?

ধর্মশিক্ষার ছয়টি দিকের তিনটি দিক সাধারণ শিক্ষার অঙ্গীভূত বলা যাইতে পারে। প্রথম—চরিত্রের ও নীতির গঠন, দ্বিতীয়—বিভিন্ন ধর্মসাহিত্য অধ্যয়ন এবং তৃতীয়—ইতিহাসের যে ধর্মবিষয়ক দিক আছে তাহার অধ্যয়ন। চরিত্রগঠন সম্বন্ধে আগেই বলা হইয়াছে। এই মূলসূত্রগুলি নূতনপন্থী শিক্ষার প্রধান উপাদান। ধর্মশিক্ষার অপর তিনটি দিক সাধারণ শিক্ষার

অন্তর্ভুক্ত নহে, যেমন আত্মশাসন, সামাজিকতাবোধ, দূরদর্শিতাজনিত চরিত্রগঠন।

বিশ্বসাহিত্যের একটি বিশেষ অংশ হইল ধর্মসাহিত্য। সম্প্রদায় বা দলগত বৈষম্যের কথা এই সাহিত্যচর্চায় উত্থাপন করিবার প্রয়োজন নাই। ডান্টের (Dante) ইনফার্নো (Inferno) পড়িতে যাইয়া নরকের যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহা প্রকৃত চিত্র কিনা অথবা মিল্টনের (Milton) প্যারাডাইস লস্টে (Paradise Lost) মিল্টনের দর্শন সত্য বা মিথ্যা এই সব বিচার করিবার প্রশ্ন ওঠে না। এই সব সাহিত্যের সুন্দর ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার ও ভাব সাম্প্রদায়িক তর্ক না তুলিয়া উপভোগ করা যায়।

বাইবেলের (Bible) কথা স্বতন্ত্র। নানারকম ধর্মপ্রতিষ্ঠান ইহার নানারকম অর্থ বাহির করিবে, সুতরাং সেই সব প্রতিষ্ঠানের অধীন হইয়া ছেলেমেয়েরা অন্য কোন ভাবে বা অর্থে বাইবেল পড়ে তাহা মাতাপিতারা হয়ত পছন্দ করিবেন না। শুধু সাহিত্যহিসাবে বাইবেল পড়ার যে মূল্য আছে তাঁহারা তাহা হয়ত বুঝিতে পারেন না। সুতরাং বাইবেলপাঠের বিষয়টি—বাড়ী বা চার্চ অথবা ছাত্রের ব্যক্তিগত সুবিধার উপর ছাড়িয়া দেওয়া হউক।

ধর্মসাহিত্যের অনেকখানিই ঐতিহাসিক। ইতিহাসের প্রধান পাঠ্যবিষয় অনেকক্ষেত্রে ধর্মকে কেন্দ্র করিয়াই রচিত হইয়াছে। যথা আমেরিকার উপনিবেশ স্থাপন, ইউরোপের

ধর্মসংঘ আন্দোলন বা "প্যালেস্টাইনের" যুদ্ধবিরোধ ইত্যাদি সব ঘটনায়ই ইতিহাসের উপর ধর্মবিরোধের প্রভাব প্রতীয়মান হয়। সুতরাং সাধারণ স্কুলে পাঠ্যক্রমে এইদিক দিয়া ধর্মের স্থান রহিয়াছে।

এই তিনটি দিক ছাড়া ধর্মশিক্ষার অপর তিনটি দিক আছে। ঐগুলি সাধারণ শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত নহে। যথা—ধর্মের তাত্ত্বিক দিক, আনুষ্ঠানিক দিক ও ভগবানের সহিত মানুষের সম্বন্ধের দার্শনিক দিক। ধর্মশিক্ষার এই তিন দিক সাধারণ স্কুলের পাঠ্যবিষয়ে স্থান পাইতে পারে না।

ধর্মমত বিভিন্ন হইবেই। যেহেতু পাব্‌লিক স্কুলে (Public School) নানা ধর্মপন্থী পরিবার হইতে ছাত্ররা আসে, তাহাদের কোন একটি ধর্মতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া চলে না। আবার সকল ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করা যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ। ধর্মের অনুষ্ঠান সম্পর্কে নানা ধর্মের নানা বিধান, সুতরাং ধর্মশিক্ষার তাত্ত্বিক এবং অনুষ্ঠানের দিক সাধারণ স্কুলে স্থান পায় না। অবশিষ্ট দিক ভগবান ও মানুষের সম্পর্ক। প্রায় প্রত্যেক ধর্মেই ইহা ধর্মমত এবং ধর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং পাঠ্যবিষয়ে ইহাকে বাদ দিতে হয়; কিন্তু একটি সাধারণ ধর্মভাব সকল ধর্মমতের ছাত্রদের মধ্যেই বিদ্যমান। এই ধর্মভাব কোন বিশেষ ধর্মতত্ত্ব বা ধর্মানুষ্ঠানের সহিত যুক্ত নহে। হয়ত ব্যক্তিগত ধ্যান বা প্রার্থনার সময় বা প্রকৃতির সান্নিধ্যে অথবা কোন মহৎ শিল্পকলার সংস্পর্শে অথবা মন্দিরে, কিংবা মসজিদে কোন

মহিমময় শান্ত উদার মহৎ শক্তির আধার কোন সত্তার সহিত কোথায় যেন আত্মীয়তার যোগাযোগ অনুভূত হয়। এই মহৎ ধর্মভাব পরিশেষে আধ্যাত্মিক অনুভূতির চরমে পৌঁছাইয়া যায় —ইহাই ধর্মের আসল কথা বা সারমর্ম। ইহা শিখানো যায় না —ইহা অনুভব করিবার বিষয়। আচার-অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া ইহার পথ তৈরী হইতে পারে। সুন্দর ও বিরাটের নৈকট্যে অথবা সঙ্গীতের মাধুর্যে ইহার অনুভূতি জাগিতে পারে কিন্তু অন্তরের অন্তস্তলের গভীর প্রশান্তিতেই ইহার উৎপত্তি।

চরিত্র এবং নীতি, ধর্ম হইতে পৃথকভাবে গড়িয়া তোলা সম্ভব। কোন বিশেষ ধর্মমতের মানুষই কেবল সৎ হইতে পারে অপর কেহ নহে, এরূপ দাবী কোন ধর্মপন্থী করিতে পারে না। অতএব সাম্প্রদায়িক ধর্মমতশিক্ষা স্কুলে স্থান পাইতে পারে না। কিন্তু ধর্মের মূল উৎস নীতিতে নহে, অন্তঃকরণে, অনুভূতির জাগরণে। ধর্মের সেই অনুভূতি জীবনে শক্তি ও সার্থকতা সঞ্চার করে।

এইরূপ গভীর ধর্মভাবের অনুভূতি পরিবারের মধ্যে সঞ্চারিত হইতে পারে। কিংবা কোন ধর্মস্থানেও লাভ হইতে পারে; অথবা কোন শিক্ষকের সান্নিধ্যেও অনুভূত হইতে পারে। নির্জনতার মধ্যে এই অনুভূতি লাভ হইতে পারে। ইহা পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না।

স্কুল যদি ধর্মসাহিত্য অধ্যয়নের, সাহিত্যের রসগ্রহণের এবং ধর্মের ঐতিহাসিক তাৎপর্য বুঝিবার শিক্ষা দেয় এবং শিক্ষার্থীদের

আত্মানুশাসন শিক্ষা দেয় এবং মানুষের কল্যাণের প্রতি নিষ্ঠা ও দূরদর্শিতা শিক্ষাদান করে তবে স্কুলের কর্তব্যপালন করা হইল বলা যাইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রগতিশীল শিক্ষার আরম্ভ ও প্রকৃতি

প্রগতিশীল শিক্ষার কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নাই। কেননা ইহার রূপ ক্রমাগতই পরিবর্তিত হইতেছে, ইহার কোন বিশেষ দিক লইয়া বলিবার চেষ্টা ও সুযোগ করিয়া উঠিতে না উঠিতেই দেখা যায় উন্নতি আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। অনন্তকালের জন্য ইহার কোন চিরস্থায়ী নীতিও নাই; না ইহার পাঠ্যগ্রন্থ আবহমান কাল একই ভাবে থাকিবে, না ইহার পাঠপ্রণালী সর্বসময়ের জন্য একই নির্দিষ্ট পথে চলিবে। মূলকথা, এ শিক্ষা পরিপূর্ণভাবে জীবন্ত আর জীবন্ত বলিয়াই ইহার গতি ও বৃদ্ধি রহিয়াছে।

বিজ্ঞান মানবজীবন সম্বন্ধে অনেক কিছুই দিনের পর দিন আবিষ্কার করিতেছে। মানুষের জন্ম, শারীরিক বৃদ্ধি, তাহার শিক্ষাদীক্ষা, তাহার পরিবেশ, তাহার স্থান ইত্যাদি সকল কিছুর সম্বন্ধে বিজ্ঞানের বলিবার অধিকার দেখা যায়। তবুও কোন বিশেষ ক্ষেত্রে ও সকল বিষয়ে বলিতে বিজ্ঞান এখনও অসমর্থ। পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও গত অর্ধশতাব্দীতে আশ্চর্য দ্রুত পরিবর্তন ঘটিয়াছে। আবার বিজ্ঞানের সকল শাখা 'মানুষকে' কেন্দ্র করিয়া গবেষণা করিতেছে। তাহা যেমন

জটিল তেমনই দুর্বোধ্য, আজ এক সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হইতেছি, হয়ত কালই তাহার আমূল পরিবর্তন ঘটিবে। সুতরাং যে চিন্তাধারা এখন অনিশ্চয়তার ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া আছে শিক্ষাক্ষেত্রে যদি সেই চিন্তাধারার প্রয়োগ হইতে থাকে, তবে শিক্ষাক্ষেত্রেও আমরা অনবরত পরিবর্তন লক্ষ্য করিব ইঁহাতে কোন সন্দেহ নাই। দেখা যায় সমাজও পরিবর্তনশীল। বিজ্ঞানের আবিষ্কারের কল্যাণে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল ক্রমশ নিকটতর হইতেছে। উন্নততর যানবাহন, ব্যবসাদির প্রসার, যোগাযোগের নব নব উপায় এবং সকল স্থানের শিল্পসম্পদের জগতের বাজারে আনাগোনার ফলে ইহা ঘটিয়াছে। দেশদেশান্তরে মানুষের পরস্পরের প্রয়োজন পরস্পরের কাছে অত্যধিক ; ফলে সর্বত্রই জীবনধারণপ্রণালী ক্রমশই পরিবর্তিত হইতেছে। অতীতে যে রকম শাসনব্যবস্থা ছিল, যে রকম অর্থনীতি দেশে প্রচলিত ছিল, আজ তাহার প্রয়োজন যে থাকিবে না ইহা বিচিত্র কি ? পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী, কেন না আমাদের প্রত্যেকের প্রয়োজন বিভিন্ন। নূতন কোন সমস্যার আবির্ভাব হইলে সমাধানের পথ আবিষ্কার করা হয়। তদনুসারে সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থারও যে পরিবর্তন হইবে, ইহাতে আশ্চর্য কি ? সমাজের নূতন আদর্শকে গ্রহণ করিতে অগ্রণী হইতে হইবে বিদ্যায়তনগুলিকে। নূতন শিক্ষাকে বিজ্ঞানের অগ্রগতি তথা মানবসমাজের উন্নতির তালে তালে চলিতে হইবে। শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের

প্রতি লক্ষ্য রাখিতে, সর্বপ্রকারের সাহায্য দিতে নূতন শিক্ষা বদ্ধপরিকর। প্রত্যেকের বিশেষ ক্ষমতা, শক্তি ও অনুরাগ (interest) বিবেচনা করিয়া সেই অনুসারে কোন্ সময়ে, কি ভাবে, কি জিনিস কতটুকু তাহাদের সামনে তুলিয়া ধরিতে হইবে—ইহা স্থির করাই প্রগতিশীল শিক্ষার কাজ।

কিন্তু এই প্রকার শিক্ষার জন্ম আজ হইতেছে এমন নহে, ইহা প্রাচীনকাল হইতেই আসিতেছে। ইতিহাস ইহাই সাক্ষ্য দেয় যে বিভিন্ন সময়ে প্রাচীনপন্থীর সহিত নূতনপন্থীর সংঘর্ষ হইয়াছে। যেখানেই পুরাতন সবকিছুকে অর্থহীনভাবে আঁকড়াইয়া রাখিবার চেষ্টা হইয়াছে, সেখানেই নূতন চিন্তাধারা প্রবল স্রোতে তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। যাহা হইতেছে তাহাই চলিবে—এইরূপ সূত্রে প্রাচীনপন্থীরা এক প্রকারের আশ্বাস পাইয়া থাকেন। নূতন ধারা সকল কিছুই শিথিল করিয়া দিবে, তাঁহাদের ভয়। সক্রেটিসের সময় হইতে ডিউয়ী পর্যন্ত নূতন শিক্ষা প্রবর্তনের আন্দোলন চলিয়া আসিতেছে, প্রাচীনপন্থীরা সর্বদাই তাহাতে বিরোধিতা করিয়াছেন।

প্রাচীনকালেও শিক্ষাক্ষেত্রে বহু প্রতিভাবান মনীষীর আবির্ভাব হইয়াছিল। বর্তমান যুগের প্রথম দিকে প্রকৃত প্রগতিশীল শিক্ষার প্রথম উদ্যোক্তা দেখা দিয়াছিলেন সুইজারল্যাণ্ডে। পেস্টালোৎসি (Pestalozzi) প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে এক স্কুল প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার যে মতামত তিনি লিখিয়া গিয়াছেন সেই উৎকৃষ্ট

ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে কার্যে পরিণত করিতে পারিয়াছে এরূপ স্কুল আজও খুব কম দেখা যায়। পেস্টালোৎঝির অর্ধশতাব্দী পরে জার্মানীতে ফ্রয়বেল (Froebel) নামক জনৈক শিক্ষক অনেক নূতন পন্থায় বিদ্যাশিক্ষার প্রচার করেন। তাঁহার ন্যায় শিক্ষাদাতা এই যুগের প্রগতিশীল শিক্ষাকেন্দ্রেও অতি বিরল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কর্নেল ফ্রান্সিস্ পার্কারকে (Colonel Francis W. Parker) এই প্রগতিশীল শিক্ষার প্রথম উদ্যোক্তা বলিয়া প্রোঃ ডিউয়ী (Prof. Dewey) সম্বর্ধিত করিয়াছেন। বিভিন্ন রাষ্ট্রের পরস্পরের বিরোধ দেখিয়া মন যখন তাঁহার একান্ত পীড়িত তখন তিনি এমন এক শিক্ষা-ব্যবস্থার কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন যাহার কল্যাণে মানুষ পরস্পরের প্রতি হানাহানি ও বিরোধ ভুলিয়া গিয়া "মানুষ" ভাবে পরস্পরকে গ্রহণ করিতে পারিবে। তিনি পেস্টালৎঝি (Pestalozzi) ও ফ্রয়বেলের (Froebel) আদর্শ সামনে রাখিয়া শিশুদের প্রতি সহজাত প্রেমবশে প্রাচীন শিক্ষা-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করিলেন। তাঁহার মনে ধারণা ছিল যে তৎকালে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুর উপর অত্যধিক অবিচার করা হইত। তাই তিনি তাঁহারই প্রবর্তিত মতে পাবলিক স্কুল (Public School) প্রতিষ্ঠা করিলেন, এবং নিজেই ইহাদের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন। সিকাগো টিচার্স কলেজের (Chicago Teacher's College) অধ্যক্ষ

থাকাকালীন তিনি এই নূতন শিক্ষানীতি শিক্ষকদের সামনে তুলিয়া ধরিলেন, এবং একটি প্রদর্শনী জাতীয় স্কুলের (demonstration school) প্রতিষ্ঠা করিলেন—যেখানে ঐ শিক্ষানীতির প্রয়োগ চলিতে পারে। এই স্কুলেই ঘটে শিক্ষার নবজাগরণ। ক্লাশে, মাঠে, ভ্রমণে, ঘরে, চলচ্চিত্রে, পুস্তকে ও ম্যাগাজিনে, বিজ্ঞানে ও মতবাদে, কাজে ও চিন্তাধারায়, রঙের তুলিতে ও মাটির কাজে—সব কিছুতেই নূতনের প্লাবন দেখা দিল। ওয়াশবার্ন লিখিয়াছেন—'আমার মা কর্নেলের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন, সুতরাং সেই সময়ে কাগজে নূতন শিক্ষাবিষয়ে যে সকল কঠোর সমালোচনা বাহির হইত, মা সেইগুলির যথাযথ উত্তর দিবার উদ্দেশ্যে সংবাদপত্রে ধারাবাহিক প্রবন্ধাদি লিখিয়া সমর্থন জানাইতে লাগিলেন। ফলে আমাদের বাড়ীতে তুমুল আলোচনা চলিত। বচসা এমন ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিল এবং রাজনীতিবিদ্‌গণ পার্কারকে (Parker) এরূপ বিব্রত করিতে লাগিলেন যে শ্রীমতী ইমন্‌স ব্লেন (Emmons Blaine) কর্নেলকে একটি নূতন স্কুল খুলিয়া দিবেন স্থির করিলেন, সেই পরিকল্পনা কার্যকরী হইল। সিকাগো ইনষ্টিট্যুটে (Chicago Institute) কিনডার্গার্টেন (Kindergarten) হইতে ট্রেনিং কলেজ পর্যন্ত শিক্ষাকার্য চলিতে লাগিল। আমি তখন সেইখানে পঞ্চম শ্রেণীতে পড়িতাম। সেই ইন্‌ষ্টিট্যুট (Institute) পরে যখন দক্ষিণ সিকাগো ইউনিভার্সিটিতে চলিয়া যায় তখন তাহার

'স্কুল অব এডুকেশন' (School of Education) নামকরণ করিয়া কর্নেলকে তাহার প্রধান আচার্যরূপে গ্রহণ করা হইল। উত্তর সিকাগো নগরবাসী যাহারা নূতন শিক্ষার স্বাদ পাইয়াছিলেন, সেই অঞ্চলেও ঐরূপ স্কুল স্থাপিত হউক এই ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ফলে মিসেস্ ব্লেন পার্কারেরই এক শিক্ষক ফ্লোরা কুকের (Flora Cooke) অধীনে সেই অঞ্চলে এক স্কুল প্রতিষ্ঠা করিলেন। যুক্তরাষ্ট্রে পার্কারের এই স্কুলটি সুবিখ্যাত। ইহা বহু প্রগতিশীল স্কুলের অগ্রদূত এবং আমেরিকার শিক্ষাব্যবস্থায় ইহার প্রভাব অসীম। সিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকিবার অল্পকাল পরেই পার্কারের মৃত্যু হয়, তাঁহার স্থানে অধিষ্ঠিত হইলেন এক যুবক অধ্যক্ষ, জন ডিউয়ী (John Dewey)। স্বামীস্ত্রীতে তাঁহাদের বাড়ীতেই ছোট একটি স্কুল খুলিয়া দিলেন—সেখানে শিশুদের অবাধ স্বাধীনতার পরিবেশে শিক্ষা দেওয়া হইত। মিসেস ব্লেনের বাড়ীতে ডিউয়ী যে সকল ভাষণ দিয়াছিলেন তাহাই প্রকাশিত হয় 'স্কুল এণ্ড সোসাইটি' (School and Society) নামক পুস্তকে।

কয়েক বৎসর পরে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে (Columbia University) ডিউয়ীকে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত করা হয়। সেইখানে 'ডিমক্রেসী ইন্ এডুকেশন' ('Democracy in Education') পুস্তকখানা লিখিবার তাঁহার সুযোগ ঘটিয়াছিল। এই পর্যন্ত পেস্টালোৎসি, ফ্রয়বেল, কর্নেল পার্কার

(Pestalozzi, Froebel, Colonel Parker) প্রমুখ শিক্ষাবিদ্‌গণ যে সকল কথা বলিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন ডিউয়ী এই পুস্তকে যত্নসহকারে সুচিন্তিত ধারায় তাহাই প্রকাশ করিলেন, সেইজন্য আজ প্রগতিশীল শিক্ষার সহিত ডিউয়ীর নাম অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত আছে।

কিন্তু ডিউয়ীর এই প্রকাশভঙ্গী সকলের বুঝিবার পক্ষে তেমন সহজ ছিল না, তাঁহার ভাষণ শুধু শিক্ষিত সমাজই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত। তাঁহারই এক সহকর্মী কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কিল্‌পেট্রিকের (Kilpatrick) লিখিবার ভঙ্গী ছিল সুন্দর, সহজ ও সতেজ। এই সম্পদের দৌলতে কিল্‌পেট্রিক ডিউয়ীর ভাবধারাকে এবং তৎসহ নিজের ভাবধারা যতটা ডিউয়ীর অনুযায়ী ছিল তাহা সর্বসাধারণের সহজবোধ্য করিয়া প্রকাশ করিলেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের অবসানে এই সকল নেতাদের যুদ্ধজনিত দুঃখপীড়িত হৃদয়ে এক ভাবনার উদয় হইল যে, কি করিয়া এই শিক্ষার প্রসার ও প্রচার হইতে পারে। সেই উদ্দেশ্যে তাঁহারা "প্রগতিশীল শিক্ষা সংসদ" (Progressive Education Association) গঠন করিলেন, ডিউয়ী অনুপস্থিত থাকিলেও তাঁহাকে অবৈতনিক সভাপতি নির্বাচিত করা হইল। কিল্‌পেট্রিক তখনও তত বিখ্যাত হন নাই, কিন্তু পরে এই সঙ্ঘের জন্য তিনি যথেষ্ট কাজ করিয়াছেন।

প্রথম প্রথম কেবলমাত্র প্রাইভেট স্কুলের প্রতিনিধিরাই

ছিলেন এই সঙ্ঘের সদস্য, ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে পাব্লিক স্কুলের সর্বপ্রথম সদস্য হইলেন ওয়াশবার্ন। সঙ্ঘের উদ্দেশ্য ছিল শিশুদের পূর্ণ স্বাধীনতার মধ্যে গড়িয়া তোলা এবং তাহাদের গ্রহণশক্তিকে উৎসাহিত করা। এই শিক্ষাকে "শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা" বলা হয়, তবে সে যুগে তখন পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফল শিক্ষাব্যবস্থায় প্রতিফলিত হইবার সুযোগ পায় নাই।

১৯৩০ সালে ধারা বদল হইয়া গেল; পরিবর্তনের ঢেউয়ে দেখা গেল যে পাবলিক স্কুলের (Public School) প্রতিনিধিদের সেই সঙ্ঘের উপর প্রভাব সর্বত্র। শাসনব্যবস্থায়, অধ্যাপনা বিভাগে সর্বত্র যেন তাঁহাদেরই রাজত্ব।

এই সময় প্রগতিশীল শিক্ষা আমেরিকায় প্রচণ্ড আলোড়ন আনিয়া দিল, ইহার প্রভাব হইল অপরিসীম। শিক্ষা-সমিতির সভ্য-সংখ্যা আট নয় হাজার পর্যন্ত পৌঁছাইল, কিন্তু ইহাদের অর্ধেক সংখ্যক সভ্য ছিলেন লাইব্রেরীর লোক, যাঁহারা পুস্তক প্রকাশনেই ছিলেন বেশী উৎসাহী। সমিতি তখন নানা জায়গা হইতে, বিশেষ করিয়া "রকফেলার সাধারণ শিক্ষা বোর্ড" এবং "কার্নেগি কর্পোরেশন" হইতে মোটা টাকা সাহায্য (grant) পাইতে লাগিল, বৈজ্ঞানিক গবেষণা আরম্ভ হইল। পরবর্তী আট বৎসরে যে পরিমাণ গবেষণাকার্য চলিতে লাগিল, তাহা যেমন চমকপ্রদ তেমনই অমূল্য।

ঠিক এই সময়ে প্রগতিশীল শিক্ষার উদ্দেশ্য আরও প্রসারিত

হইল। এখন এই সব শিশুশ্রেণীর স্কুলগুলিতে ছাত্রদের মনে গণতন্ত্রের উপযুক্ত দায়িত্বশীল নাগরিক মনোভাব গঠনেরও চেষ্টা চলিতে লাগিল, পার্কারের নীতিতে এতদিন ইহা সুপ্তভাবে নিহিত ছিল।

কিন্তু এই নূতন চেতনা একটা বিশেষ অস্বস্তির সৃষ্টি করিল। যাঁহারা পরিবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন না তাঁহারা ভাবিলেন—ইহারা চরমপন্থী। এক প্রকার ভগ্নোদ্যমের মনোভাব তখন সারা দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে, কেন এত দেশজোড়া বেকার সমস্যা। কেন এমন প্রাচুর্যের মধ্যেও অনাহারের হাহাকার, কেনইবা অন্ন থাকিতেও জনগণ অভুক্ত থাকিবে—এই সকল সমস্যা জনসমাজকে পাগল করিয়া তুলিল। জর্জ কাউণ্টের একটি পুস্তিকাতে লোককে আশ্বস্ত করা হইল যে স্কুলের পক্ষে নূতন সামাজিক জীবন আরম্ভ করা অসম্ভব। কিন্তু তখনকার সামাজিক নিয়ম যাহা প্রচলিত ছিল তাহারও প্রতি বিশ্বাস ও আস্থার যে অভাব সেই পুস্তিকাতে প্রকাশ পাইল, তাহা কঠোর নিয়মানুগত্যপন্থীদের ভয়চকিত করিয়া তুলিল।

কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আরম্ভের আভাসে চরমপন্থীরা প্রবল হইয়া উঠিল, সমিতির প্রভাব তখন আর তত প্রবল রহিল না। যাহা রহিল তাহা শুধু পূর্ববর্তী সমিতির ছায়াস্বরূপ হইয়া বাঁচিয়া রহিল। সম্প্রতি প্রগতিশীল শিক্ষা আবার মাথাঝাড়া দিয়া উঠিয়াছে।

ইহার প্রবর্তন যে শুধু আমেরিকাতেই দেখা দিল তাহা

নহে। প্রকৃতপক্ষে সারা পৃথিবী ব্যাপিয়া নানাস্থানে ইহার প্রভাব বোধ করা গেল। কর্নেল পার্কার (Colonel Parker) যখন নর্মাল স্কুলের প্রতিষ্ঠায় পূর্ণ উদ্যমে লাগিয়া গেলেন সেই সময়েই ১৮৮৯ সালে সেসিল রেডি (Cecil Reddie) ইংল্যাণ্ডে এবট্‌স্‌হোম (Abbotsholm) নামে ছেলেদের জন্য একটি বোর্ডিং স্কুল খুলিলেন—তিনি তখনও পার্কার সাহেবের নাম শোনেন নাই, কিন্তু তাঁহার নীতির সহিত রেডিসাহেবের চিন্তাধারার সামঞ্জস্য ছিল। তিনবৎসর পরে রেডিসাহেবের এক সহকর্মী জে, এইচ, বেড্‌লি (J. H. Badley) Bedales নামে একটি সহশিক্ষা আবাসিক স্কুল খুলিলেন। ইহাকে এখনও প্রগতিশীল স্কুলের অন্যতম বলা যাইতে পারে। ইংল্যাণ্ডে ইহার সূত্রপাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জার্মানী, সুইজারল্যাণ্ডে এবং ফরাসী দেশে কতকগুলি নূতন স্কুলের অভ্যুদয় হয়। পরবর্তী বিশ বৎসর কালের মধ্যে ইউরোপের এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নানাস্থানে এই স্কুলের প্রচলন হয়।

প্রথম মহাযুদ্ধের অবসানে নূতন শিক্ষা আন্দোলনের কয়েকজন নেতা ক্যালে (Calais) নগরে মিলিত হইয়া "নূতন শিক্ষা সমিতি" গঠন করিলেন, আন্দোলন বাড়িয়া উঠিল। পাব্‌লিক ও প্রাইভেট উভয় প্রকারের স্কুলই ইহাতে প্রভাবান্বিত হইল। ১৯২৭ সালের মধ্যে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন অংশে সমিতি গড়িয়া উঠিল, সেই বৎসরে লোকার্নোতে দুই সপ্তাহব্যাপী সম্মেলনে, ৫৭টি দেশের প্রতিনিধি সম্মিলিত

হইয়াছিলেন। ইহার পাঁচ বৎসর পরে Nice সহরে "প্রগতিশীল শিক্ষা সমিতি এবং নূতন শিক্ষা সমিতি" একত্র মিলিত হইল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এই আন্দোলন কিছুটা নিস্তেজ হইয়া পড়িল। ইউরোপে এবং যুক্তরাষ্ট্রে ইহার পূর্বে "একনায়কত্বের" উদ্ভবে রুশ, ইটালি, জার্মানী ও স্পেনে এই আন্দোলন মন্দীভূত হইয়া পড়িয়াছিল। যে সমিতির উদ্দেশ্য পরস্পরের প্রাধান্য বা সম্মানরক্ষা এবং উন্নত রকমের সহযোগিতা, একনায়ক শাসনতন্ত্র কখনও সেই প্রকার সমিতিকে বরদাস্ত করিতে পারে না।

যুদ্ধের অবসানে ইটালি ও পশ্চিম জার্মানীতে নূতন শিক্ষা সমিতির শাখা গড়িয়া উঠিল। মোটকথা, স্বাধীন রাষ্ট্রের সর্বত্রই ইহার বিস্তার হইল।

U. N. E. S. C. O. এই সভাকে পরিবারভুক্ত করিয়া লইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে গবেষণার কাজও চলিতে লাগিল। আজ অস্ট্রেলিয়াতে ইহার কল্যাণে বিভিন্ন দেশের শিক্ষাবিদ্‌দের সম্মেলন এবং তাঁহাদের ভাষণ শুনিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে। গণতান্ত্রিক সকল দেশগুলিতে প্রগতিশীল চিন্তাধারা অগ্রগতির পথে চলিয়াছে। প্রগতিশীল শিক্ষার উদ্ভবের ইতিকথা এইরূপ। এখন দেখা যাক প্রগতিশীল শিক্ষা কি?

পাঠকেরা বুঝিবেন এই শিক্ষাপদ্ধতির পুরাপুরি বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নহে। আমাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে

এই শিক্ষাধারার পরিবর্তন হইতেছে। তবে বর্তমানে যে ব্যবস্থা চলিতেছে তাহার বর্ণনা দেওয়া যাইতে পারে। সাধারণত কোন একটি স্কুলকেই আদর্শস্থানীয় বলা যাইতে পারে না—কারণ নূতন পদ্ধতির সকল বৈশিষ্ট্যগুলি কোন একটি স্কুলেও বিদ্যমান নাই।

শিক্ষক—শিক্ষককেই নূতন শিক্ষার কেন্দ্রস্বরূপ বলা যাইতে পারে। কোন নীতি, কোন কানুন বা কোন পাঠ্যক্রম ছাত্রদের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে না, যদি উহার অনুশীলনে শিক্ষকের সহায়তা না থাকে। শিক্ষককে সর্বপ্রথমে যুগের ধারায় অনুপ্রাণিত হইতে হইবে। উচ্চ শিক্ষা তাঁহার সম্পদ। যাহাকে যথার্থ শিক্ষা বলা যায়—সেই শিক্ষা তাঁহার থাকা চাই। সকল বিষয়ে জ্ঞান থাকিবে, সকল ব্যাপারে জগতের সহিত তাঁহার জ্ঞানবুদ্ধির ও ভালবাসার সম্বন্ধ থাকিবে, যে বিষয়ে তিনি শিক্ষাদান করিবেন সে বিষয়ে বিশেষ পাণ্ডিত্য তো থাকিবেই। তবেই তিনি উপযুক্ত শিক্ষকের পদে সমাসীন থাকিতে পারিবেন। শুধু জ্ঞান সঞ্চয়ে নহে, কি করিয়া জ্ঞান দান করিতে হয় সে সম্বন্ধেও শিক্ষকের পারদর্শিতা বিশেষ বিচার্য। শিক্ষা দিবার কালে কি করিয়া শিক্ষাবস্তুকে মনোরঞ্জক ও উদ্দীপক করিয়া তোলা যায়, এবং কোন সময়ে কতটুকু শিক্ষার বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া পড়াইতে হইবে, সেই বিষয়ে জাগ্রত জ্ঞানই ভাল শিক্ষকের পরিচায়ক। তা ছাড়া ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে আত্মীয়তার সম্বন্ধ জগতের অমূল্য সম্পদ। উভয়ের মধ্যে

দাবী-দাওয়া, আদান-প্রদান শ্রদ্ধা-ভালবাসার যে অপূর্ব সম্পর্ক তাহা প্রকৃতই মহত্বপূর্ণ। এই সুমধুর সম্পর্ক থাকিলে তবে উহা শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুকে ছাত্রের পক্ষে লাভদায়ক করিয়া তুলিতে পারে। ছাত্রদের প্রয়োজনে শিক্ষক মহাশয়ের সহায়তা অনিবার্য।

শ্রেণী—শ্রেণীতে থাকিবে সুন্দর ঘরোয়া পরিবেশ। শিশুদের নিজেদের কাজ ইচ্ছানুসারে বসিয়া বা দাঁড়াইয়া, যেভাবে তাহাদের আনন্দ ও সুবিধা হয় সেইভাবে করিতে দেওয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয়। চেয়ার টেবিলে বা নীচে বসিয়া যেখানে তাহারা আলোচনা অথবা কাজ করিতে পারে সেইরূপ আবহাওয়া বাঞ্ছনীয়। ছাত্ররা পরস্পর বন্ধুভাবে মেলামেশা ও কাজ করিলে যে তাহাদের ইচ্ছার প্রশ্রয় দেওয়া বা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করা হয়, এমন নহে। এভাবেও শৃঙ্খলা রক্ষিত হয়, যখন কাজে অনুরক্ত ছাত্রছাত্রীরা আপনা হইতেই দলবদ্ধ হইয়া যায়। শিক্ষক কিছু বলিলে আগ্রহী দল অবশ্যই নিঃশব্দে শুনিবে, প্রয়োজন হইলে শান্তভাবে পুস্তকাদি পড়িবে, সময়ের অধিকাংশই কার্যকরী আলোচনা ও কর্মে ব্যয়িত হইবে।

নিয়ন্ত্রণ বা অনুশীলন গণতান্ত্রিকভাবে হওয়া চাই; কোন্ নিয়মকানুন প্রচলিত হওয়া দরকার বা নিতান্ত বাঞ্ছনীয়, তাহা ছাত্র ও শিক্ষকের সমবেত পরিকল্পনার পরে প্রবর্তিত হইবে। শিক্ষক কর্তৃপক্ষ, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে নিরর্থক কর্তৃত্ব করার অবকাশ তাঁহার কমই আসিবে। কেননা আত্ম-শাসন

(self-discipline)-এর মূল্য প্রত্যেক ছাত্র ভাল করিয়া বুঝিবে। তাহার ফলে গোষ্ঠীর স্বার্থের কাছে স্বীয় স্বার্থ বলি দিতে তাহারা বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করিবে না।

পাঠ্যবস্তু—এই ব্যবস্থায় এমন কিছু আছে, যাহা পুরাতন-পন্থী স্কুলে শিখিতে হয় না, যেমন আত্মনিয়ন্ত্রণ ও সৃজনের কাজে আত্মপ্রকাশের ক্ষমতা। সৃজনী বৃত্তি প্রকাশের রূপ নানাভাবে হইতে পারে। যেমন রং তুলি, কাদামাটি, লিখন ও ভাষণ, বন্ধুবান্ধব আত্মীয় পরিজনের সঙ্গে মিলিত হইয়া বসবাস করা, সমাজে স্বীয় স্থান খুঁজিয়া লওয়া, বিশ্বে আপন স্থান আবিষ্কার করা, নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা, নিজের আগ্রহ অনুরাগ বুঝিতে শেখা এবং নিজের শক্তি ও দুর্বলতা জানিতে পারা অর্থাৎ এক কথায় "নিজেকেই চেনা" হইল প্রগতিশীল শিক্ষার মূলকথা। তবে পড়া, লেখা এবং সংখ্যাগণনের কাজ এখানে নাই এমন নহে। প্রকৃতপক্ষে এইগুলি অতি সুন্দরভাবে শিখান হয়। কোন কিছুর শিক্ষা আয়ত্ত হইয়াছে বলিতে আমরা এই বুঝি যে, সে জিনিসের সার্থকতা পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধ হইয়াছে এবং দৈনন্দিন জীবনে তাহাই মানুষ প্রয়োগ করিতে সক্ষম। তবে তাহা প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থায় যেরূপ সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয় তেমন আর কিছুতেই সম্ভব নহে।

মানুষের জীবননির্বাহ কিভাবে হয়, কিভাবে তাহারা পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া বসবাস করে ইত্যাদি শিখিতে হইবে বলিয়া ইতিহাস, ভূগোল এবং বিজ্ঞানের জ্ঞানের প্রয়োজন।

কিন্তু প্রতিটি বিষয় স্বতন্ত্রভাবে খোপে খোপে রাখিয়া ত্রিশ মিনিটের মধ্যে পড়াইবার অথবা পড়িবার কোন অর্থ হয় না। বরঞ্চ কোন জটিল প্রশ্ন থাকিলে ছাত্রদের বয়স ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী তাহা উত্থাপন করা হইবে, এবং ইহাতে তাহাদের অভিরুচি ও আকর্ষণ থাকিবে। তখন সেই প্রশ্নটিকেই কেন্দ্র করিয়া পাঠ্য বিষয় শেখান যায়।

উদাহরণস্বরূপ, ধরুন মাধ্যমিক শ্রেণীতে ছেলেরা 'বাসস্থান' সংক্রান্ত কিছু পড়িবে। কয়েকটি উপায়ে এই পাঠ দেওয়া যায়। হয়ত স্থানীয় কোন বাসস্থান তৈয়ারী হইতেছে, তাহার কথা উঠিল। কোথায় সব জিনিসপত্র পাওয়া যায় তাহা জানা গেল। কাঠ কোথা হইতে আসে, বন রক্ষা কি করিয়া হয়, বনরাজি উৎখাতের ফলে দেশে কি দশা হইতে পারে, দাবাগ্নি কি করিয়া রোধ করা যায়, ইত্যাদি। তারপর ইস্পাতের কথা। পৃথিবীতে কোথায় কোথায় লৌহখনি রহিয়াছে। তাহার আমদানী ও রপ্তানীর সুবিধা এবং অসুবিধা (জলপথে ও স্থলপথে) এই সব আলোচনার বস্তু হইল। ইহার শ্রমিক সমস্যা, শ্রমিক সংঘ (Trade Union) গঠন ও উহার কার্য, সমিতি সংঘ গঠনের সুফল ও কুফল বিচার করা হইল। ইহা গেল একটি দিক। অন্য একদিকে আলোচনা চলিতে লাগিল, কি করিয়া স্থানীয় বস্তি উঠাইয়া ফেলা যায়, গৃহছাড়া সেই লোকগুলির কি অবস্থা হয়; কেন এই রকম বস্তিতে লোকেরা বসবাস করে; কেন তাহাদের মাসিক আয় এত কম থাকে,

যাহার ফলে ইহাদের নিকট হইতে মাসিক ভাড়া আদায় করিয়াও ভূস্বামীর পোষায় না; গভর্নমেণ্ট কেন কোন কোন বাসস্থানকে টাকার সাহায্যে টিকাইয়া রাখে না; ইন্সিওরেন্স বা বিমান কোম্পানীর স্থান কোথায় এবং কি ক্ষমতার বলে ঐ সকল কোম্পানী কাজ করে ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই সকল প্রশ্ন ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা অনুযায়ী বিচার করিয়া সেই সকল আলোচনা হইতে শিক্ষা ও জ্ঞান লাভ হয়। দেখা যায় যে এক বৎসরে ইতিহাস, ভূগোল ও বিজ্ঞানের যে সকল বিষয় জানাইবার ও শিখাইবার ছিল তাহা বাস্তবিকই হইয়া গিয়াছে। শুধু কোন রকমে লেখায় হাত বুলাইয়া যাওয়ার মত করিয়া হয় নাই, বরঞ্চ বাস্তব অভিজ্ঞতার সাহায্যে যাহা শেখানো হইয়াছে তাহা ছাত্রের জীবনের এক অংশস্বরূপ হইয়া গিয়াছে। ইহাই আবার স্মরণ করানো হয় পরীক্ষার মধ্য দিয়া, কিন্তু ছাত্রকে পাঠ মুখস্থ করাইয়া নহে। ইহা সম্ভব হয় এইজন্য যে, যাহা কিছু তাহারা শিখিয়াছে তাহার একটা অর্থ এবং সার্থকতা তাহারা খুঁজিয়া পাইয়াছে। শিশুর জীবন ও শিক্ষা ওতপ্রোতভাবে জড়িত রহিয়াছে।

আমাদের প্রত্যেকেরই লেখাপড়া এবং অঙ্কের সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান আবশ্যক। প্রগতিশীল শিক্ষায় ইহার মূল অর্থ গ্রহণ করিতে অসুবিধা হয় না। ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে পুরাতন শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে প্রাপ্ত অন্তর্দৃষ্টির অভাব ছিল। শিশু ও কিশোর মনের সম্বন্ধে এই অন্তর্দৃষ্টি নূতন

শিক্ষাব্যবস্থাকে যথেষ্ট সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতেছে। শিশুর প্রয়োজন বুঝিয়া তাহার শিক্ষাক্ষেত্রে উহার প্রয়োগ এক আশ্চর্য ব্যাপার।

গণিতের অনেক উদাহরণ শিশুর কাছে অর্থহীন, যেমন ২/৩ ÷ ৩/৪ এর অর্থ কি? কতটা ৩/৪ অংশ ২/৩ এর মধ্যে আছে অথবা কতটা ৩/৪ লইয়া ২/৩ হইবে তাহাই দেখিতে হইবে। পুরাতন প্রণালী যদি মনে থাকে তবে দেখিবেন যে ভাজককে উল্টা করিয়া (অর্থাৎ ৩/৪ এর জায়গায় ৪/৩ লিখিয়া) ভাজ্যকে গুণ করিলেই ভাগফল ৮/৯ দাঁড়াইবে। এখন এই ৮/৯এর কি অর্থ আছে শিশুর কাছে? জীবনে কখন এবং কোথায় সে এই রকম অবস্থার এই রকম সমাধান খুঁজিবে?

ওয়াসবার্নের এক ভাষণের সময় এই রকম প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে জনৈক ভদ্রলোক বলিয়া উঠিলেন, কেন, কতকগুলি "ধারা" ছেলেদের যে শিখিতেই হইবে। শিশুরা স্বভাবতঃ অলস ও দুষ্ট, যদি ভাল না লাগে তবুও কতগুলি জিনিস যে তাহাদের শেখা চাই। কোন একটি বিশেষ ধারা অথবা এইটিই যে শিখিতেই হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। কিন্তু আমরা বয়স্করা যাহা শিখিয়াছি তাহা তাহাদেরও যে শিখিতে হইবে তা উহারা জানে না।

উপরোক্ত বিচারে কয়েকটি ভুল রহিয়াছে। প্রথমত এক ভগ্নাংশ দিয়া অন্যকে ভাগ করার কোন অর্থ হয় না, এবং ছোট ভগ্নাংশকে বড় ভগ্নাংশ দিয়া ভাগ করা আরও অর্থহীন। বাস্তব

জীবনে যদি কেহ জানিতে চায় যে $\frac{৩}{৪}$ ভাগ মাপের কতটা টুকরা $২\frac{১}{২}$ গজের কাপড়ে পাওয়া যাইবে, তাহা হইলে সে কখনও $২\frac{১}{২} \div \frac{৩}{৪} = \frac{৫}{২} \div \frac{৩}{৪} = \frac{৫}{২} \times \frac{৪}{৩} = \frac{১০}{৩} = ৩\frac{১}{৩}$, এই নিয়মে চলিবে না। সাধারণ বুদ্ধিতে দেখা যায় যে দেড় ভাগ হইতে সে দুইটি টুকরা পাইতেছে এবং বাকী এক গজে আর এক টুকরা হইয়াও এক-চতুর্থাংশ থাকিয়া যাইবে। এই সব কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, যে জিনিসের প্রয়োগ অসম্ভব তাহা শিশুকে যে শিখাইতেই হইবে এমন কোন কথা নাই। দ্বিতীয়ত, শিশুরা অলস একথা বিশ্বাস্য নহে। ছোট শিশুর সঙ্গে সঙ্গে পা রাখিয়া যদি চলিতে হয় তবে দেখা যাইবে যে বেশী নয়—ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই কি রকম ক্লান্ত হইয়া পড়িতে হয়। মানসিক অলসতা তাহার আরও কম। তাহাকে সুযোগ দিলে দিনের মধ্যে কত অসংখ্য প্রশ্ন সে করিয়া যাইতে পারে তাহা দেখিবার বস্তু। শিশু জ্ঞানপিপাসু। প্রতিদিন কত অসংখ্য খবরের কাগজ, বই, মাসিক পত্র বিক্রয় হইতেছে। নভেলের কথা বাদ দেওয়া যাক। লাইব্রেরী, রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে কত খবর দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। কিন্তু কেবল খবরের জন্যই তো আর খবরের কাগজ নয়, তাহাতে আনন্দদায়ক ও চিত্তাকর্ষক অনেক কিছু রহিয়াছে। ইতিহাসের প্রথম হইতে আজ পর্যন্ত সারা বিশ্বের লোক জ্ঞানপিপাসায় জ্ঞানের সন্ধানে ছুটিয়াছে।

তার পর আরও একটি বিষয় দেখিতে হইবে। কোন

উদাহরণের সাহায্য ছাড়া কোন প্রক্রিয়াই সহজবোধ্য হয় না। কেন না প্রক্রিয়ার বিশেষত্ব তখনই বুঝিতে পারা যায় যখন তাহার প্রয়োগের সার্থকতা জানা যায়। আর বাস্তবজীবনে তাহার প্রয়োগই একমাত্র বোধ বা অনুভূতি (understanding) জাগাইতে পারে। যদি বাস্তবের অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করিয়া শিশুর অনুরাগ ও উৎসাহকে জাগাইয়া শিক্ষা দেওয়া হয়, তবে সেই শিক্ষা শিশুর প্রকৃতশিক্ষা হয়। গণিতের শিক্ষকদের যে অভিযোগ শোনা যায় যে শিশুর মনোযোগ তাঁহারা আকর্ষণ করিতে পারেন না—সেই অভিযোগই আর থাকিবে না।

ইহা হইতে প্রগতিশীল শিক্ষার আরও একটি বিশেষ তথ্য জানা যায়। কেবল জ্ঞান অর্জনের বিশেষ কোন মূল্য নাই—যদি না তাহার ব্যবহার হয়। কি খেলায়, কি কাজে, কি চিন্তায়, কি আনন্দ উপভোগে যদি তাহার কোন উদ্দেশ্যই না রহিল তবে নিরর্থক জ্ঞানসঞ্চয়ের সহিত কাজের কোন সামঞ্জস্য থাকে না বলিয়াই ছেলেদের স্কুল এবং এই স্কুলে পড়ার প্রতি এত বিতৃষ্ণা জন্মে, ফলে তাহাদের স্কুল পালানোর ইচ্ছা মনে জাগে। শিশুদের অবাধ্য এবং বেপরোয়া হওয়ারও ইহা এক বড় কারণ। প্রাচীন স্কুলে যাহা কিছু শিখান হইত এ স্কুলেও তাহা শিখান হয়; শুধু তাহাই নহে, অতি সুন্দর ভাবে, নিপুণতার সহিত সেই বিষয়বস্তুকে হৃদয়গ্রাহী ও চিত্তাকর্ষক করিয়া শিখিবার আগ্রহকে জাগাইয়া তোলা হয়।

শিক্ষাপ্রণালী ঃ—কোন বাঁধাধরা নিয়মে শিক্ষা দেওয়া হয় না। শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া জ্ঞানবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে সব কিছু শিখান হয়। যেমন কোন কাজে তৃপ্তি ও আনন্দের স্পর্শ থাকা চাই, তেমন জ্ঞানের বস্তুও মেলা চাই। শিশুর মনের ক্ষণিক খেয়ালের প্রশ্রয় শিক্ষক দিতে পারেন না। কোন কিছু শিখিবার প্রয়োজন ও মূল্য শিশু আপনা হইতেই বুঝিবে। তাহার আগ্রহ ও অনুরাগ কাজটি শিখিতে তাহাকে অগ্রণী করিবে। শিক্ষকের কাজ হইল ছাত্রকে উৎসাহ এবং সময়মত কাজের নির্দেশ দেওয়া।

কাজ মানসিকও হইতে পারে—যেমন মনে মনে কোন প্রশ্নের সমাধান সন্ধান করা। আবার কাজ বাহ্যিকও হইতে পারে—যেমন কিছু তৈরী করা, বাইরে যাওয়া, গানের আসরে অংশ গ্রহণ করা অথবা অভিনয় করা, ছবি আঁকা, নমুনা তোলা ইত্যাদি। হাতে কলমে করার মধ্যেই শিশু শিক্ষার সার্থকতা উপলব্ধি করে। স্বয়ং আইনস্টাইন তাঁহার মতবাদ ও জ্যোতিষিক-নীতি জগতের সামনে প্রমাণ করিবার আগে গবেষণাগারে সেই তত্ত্বের হাতে-কলমে প্রমাণ করিয়া লইয়াছেন।

ছাত্রদের ব্যক্তিগত পার্থক্য ও বিশেষত্ব সম্বন্ধে প্রগতিশীল শিক্ষক অতিমাত্রায় সচেতন থাকেন। দেখা গিয়াছে যে প্রতি ক্লাশে অন্ততঃ চার বৎসরের পার্থক্য অর্থাৎ ছাত্রদের যে নির্ধারিত মান (standard) থাকে, তাহা হইতে চার গুণ বেশী এবং চার গুণ কম যোগ্যতার ছাত্র একই ক্লাশে রহিয়াছে।

ফলে একদল খুবই শীঘ্র কোন কিছু আয়ত্তে আনিতে পারে; এবং অন্যদল ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়। কোন্ একটি অঙ্ক হয়ত একদল ছেলের বুদ্ধির নাগালের মধ্যে রহিয়াছে, আবার, কয়েকজনের পক্ষে পাঁচ বৎসর পরে সেই অঙ্ক করিলে ভাল হয়। যে বই পড়িয়া নগেন কেমন তাড়াতাড়ি বুঝিতে এবং খুশী হইতে পারিল—রাধুর কাছে তাহা যে অত্যন্তই কঠিন হইবে না—কে বলিতে পারে? শিক্ষিত পরিবারে অনুকূল পরিবেশের ফলে এবং নিজেও বুদ্ধিমান বলিয়া রাখাল নানা জায়গা দেখিয়া শুনিয়া অল্প-বয়সেই যে জ্ঞান সহজে আয়ত্ত করিয়াছে—গ্রামের দরিদ্র ঘরের সন্তান সুযোগের অভাবে হয়ত তিন বৎসর পরে তাহা জানিতে বা বুঝিতে পারিবে। প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষকের পক্ষে ছাত্রদের মধ্যে এই পার্থক্যগুলি বুঝিবার দায়িত্ব অনেকখানি।

ক্ষমতা অনুযায়ী কাজ ও শিক্ষা চালানোর মধ্যে শিক্ষকের পারদর্শিতা অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। অল্পসংখ্যক শিক্ষকই এইরূপ দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেন, তবে যতখানি তাঁহার সাধ্য শিক্ষকের পক্ষে ততখানি করাই বাঞ্ছনীয়। অবহেলা করা ঠিক নহে। শিশু যদি কোনরূপ অক্ষমতা বা অসাফল্যের জন্য লজ্জাবোধ করে বা কুণ্ঠিত হয়, বা নিজেকে হেয় মনে করে তবে শিক্ষক সেখানে দায়ী। সুতরাং পরীক্ষার সাফল্য যে বুদ্ধির মাপ-কাঠি হিসাবে আগে মানিয়া লওয়া হইত এখন তাহা অসমীচীন মনে করা হয়। কারণ যে নম্বর ছাত্রের যোগ্যতা

ও অযোগ্যতার পরিচায়ক মাত্র, সেই নম্বর ক্ষতি করা ছাড়া আর তো কিছুই করিতে পারে না। কোন ছেলে যদি ছোট জুতা পরিয়া থাকে তবে তাহাকে যেমন দোষ দেওয়া যায় না, এও ঠিক তাই। ছেলের পায়ের মাপ কি হইবে তাহা জানিবার প্রযত্ন করা হয় নাই। শুধু জুতা পরানই আমাদের যেন লক্ষ্য ছিল। মনোবিজ্ঞান সংক্রান্ত পরীক্ষা আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মানুষের প্রকৃত যোগ্যতা সম্বন্ধে কিছু জানা যাইত না। না বুঝিয়া শুনিয়া একই ধরণের কাজ সকলের জন্য নির্ধারিত হইত। আর যে তাহা করিতে অসমর্থ হইত সে কতই না অপদস্থ হইত।

এখনও কত দেশে ঠিক সময়ে শ্রেণীর কাজ না করিয়া আনিলে ছেলেদের ভয়ানক মারধর করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রে সে যুগের অবসান ঘটিয়াছে। কিন্তু সেখানেও প্রাচীনপন্থী কোন কোন শিক্ষক শাস্তিস্বরূপ কম নম্বর দিয়া থাকেন। অভিভাবকেরা সেই রিপোর্টকার্ড দেখিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হন এবং প্রতিশোধ তোলা হয় ছেলেদের উপরে। কিন্তু এই ব্যাপারে ছাত্রদের কি কোন বিশেষ অপরাধ আছে?

শ্রেণীতে কি হয়? শ্রেণীর কাজ সাধারণ কোন প্রশ্নকে (problem) কেন্দ্র করিয়া আরম্ভ হয়। তাহারই আনুষঙ্গিক বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা চলিতে থাকে। যদি প্রতিদিনের জানা ও বোঝার বাহিরে কোন শিক্ষাকে কেন্দ্র করা হয় তবে তাহার জন্য স্মৃতিশক্তির দয়ার উপর নির্ভর করিতে হয় নতুবা

সে শিক্ষার কোন মূল্য নাই। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে জানা গিয়াছে জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে শিক্ষার যতখানি যোগাযোগ ঠিক সেই অনুযায়ী শিক্ষার মূল্য কার্যকরী হইবে। শিক্ষা যেমন কর্ম ও অভিজ্ঞতাকেন্দ্রিক—তেমনই কর্ম ও অভিজ্ঞতাতেই শিক্ষার ও জ্ঞানের প্রয়োগ।

কি উপায়ে জ্ঞান আহরণ ও সঞ্চয় করা যাইবে নূতন শিক্ষা সে ব্যবস্থা শিখাইয়া দেয়। চিন্তা ও অনুভূতির স্থান অত্যন্ত উচ্চে—মিথ্যা অর্থহীন স্মৃতিশক্তির কোন মূল্য নাই। শিক্ষার্থীর উৎসাহ বাড়াইয়া তোলা, তাহার মনে অনুপ্রেরণা জাগাইয়া তাহার নিজস্ব যাহা কিছু মনের সম্পদ রহিয়াছে তাহাকে কাজে পরিণত করিবার চেষ্টা সর্বদা চলিতে থাকে। এখানে অবিচার ও অত্যাচারের স্থান নাই। যদি পরবর্তী জীবনে শিক্ষার প্রতি তাহার আসক্তি না জন্মিয়া বিতৃষ্ণাই জন্মিল, তবে সে শিক্ষার কোন মূল্য আছে কি? যিনি প্রকৃত আগ্রহ জাগাইতে পারেন সেই শিক্ষকের প্রতি, শুধু সেই শিক্ষক কেন সমগ্র শিক্ষার প্রতিই তাহার অসীম শ্রদ্ধা জন্মিবে।

উদ্দেশ্য :—প্রগতিশীল শিক্ষার উদ্দেশ্য মহৎ, মানুষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন ইহার লক্ষ্য। শারীরিক সুস্থতার সঙ্গে মানসিক স্বাস্থ্যবিধানও ইহার লক্ষ্য। মানুষ যেন মানুষের মত বাঁচিতে পারে, তাহার উৎসাহ ও আনন্দ যেন পরিপূর্ণতা পায়। ব্যক্তিগতভাবে তাহার নিজের প্রতি যে দায়িত্ব রহিয়াছে তাহা হইতেছে আত্ম-শাসন, আত্মশিক্ষা এবং আত্ম-

নির্ভরতা। সমাজ তাহাকে পরিবারের "একজন" হিসাবে চায়—তাহারই সহযোগিতায়, সহৃদয়তায়, দায়িত্বে, কর্মে ও চিন্তায় জগতের উন্নতি সাধিত হউক, শিক্ষার এই উদ্দেশ্য। শিক্ষক আমাদের পথপ্রদর্শক, গুরু। শিক্ষায়, দীক্ষায়, মহত্ত্বে তিনি সকলের আদর্শস্থানীয়। তাঁহার স্নেহধারা কখনই ক্ষীণ নহে, বিদ্যাদানে তাঁহার কার্পণ্য নাই, তিনি শিক্ষার্থীর আদর্শ; তাঁহার কর্তৃত্বে "নিষ্ঠুর প্রতাপের" পীড়া নাই; আছে সেখানে অনাবিল স্নেহ, চরিত্রের দৃঢ়তা এবং উদ্দীপনা।

সপ্তম অধ্যায়

ইহার কার্যপদ্ধতি

কিন্তু এত ব্যাখ্যানের পরও সন্দেহ হইতে পারে যে প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থা সত্যই কার্যকরী কিনা। কার্যকরী যদি বা হয়, তবে তাহা কতদূর ?

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে নূতন শিক্ষাব্যবস্থাকে আজকাল একটি বিশেষ বিজ্ঞানরূপে বিচার করিলে সুবিচার করা হইবে। কর্নেল পার্কার (Colonel Parker)-এর সময়ে কোন পরিমাপের (measurement) সুযোগ-সুবিধা ছিল না, কিন্তু আজ অনুমান ছাড়া প্রমাণের সাহায্যে দেখাইয়া দেওয়া হয় যে, কি কি অনুপাতে নূতন শিক্ষা বেশি কার্যকরী।

১৮৫৬ সালে পরিচালিত কোনও পরীক্ষাপত্র অর্ধশতাব্দী পরে কোন এক গুদাম হইতে উদ্ধার করিবার পরে ১৯২৪ সনে ম্যাসাচুসেটস্‌-এ পাব্লিক স্কুলের ছাত্রদের দেওয়া হয়। দেখা গেল যে ৬৮ বৎসর পূর্বের অপেক্ষা এই নূতন দল পরীক্ষায় বেশি সফলতা লাভ করিয়াছে।

সেই রকম ক্লিভল্যাণ্ড (Cleveland)-এ ১৮৪৮ সনে যে পরীক্ষা নেওয়া হইয়াছিল, ১৯৪৭ সনে সেই প্রশ্নপত্রের দ্বারা পরীক্ষার কোন আশ্চর্যজনক উন্নতি দেখা না গেলেও অবনতি

ছিল না। ১৮৪৮ সনের ছেলেরা যেখানে ৯২৪ পাইয়াছে, —১৯৪৭ সনের ছেলেরা সেখানে ৯৫৫ পাইয়াছে। আগেকার দিনে সাধারণতঃ সমাজের উচ্চশ্রেণীর ছেলেরাই শুধু স্কুলে যাইত। আর এখন শুধু স্কুলে যাওয়াই নহে, সমাজের সর্বশ্রেণীর ছাত্রদের কিশোর বয়স পর্যন্ত স্কুল ছাড়ার কোন প্রশ্ন ওঠে না। ১৮৫০ সনে উপযোগী ছাত্রদের মধ্যে শতকরা তিনজন মাত্র উচ্চশিক্ষার জন্য অগ্রসর হইত, ১৯২০ সনে চৌদ্দ হইতে সতের বৎসর বয়সের শতকরা বত্রিশ জন যাইত; আর এখন শতকরা বিরাশি জনই স্কুলে যায়।

যে ভাবেই হউক, প্রমাণের সহিত দেখানো যাইতে পারে যে জ্ঞানে এবং কর্মে এই যুগের ছেলেরা অনেক বেশি অগ্রসর হইয়াছে। যদি পূর্বযুগের ছাত্রদের আমাদের নূতন প্রথায় পরীক্ষা লওয়া হয়, তবে ফলাফল কিরূপ হইবে বলা যায় না। মনে হয়, এখনও যে অল্পসংখ্যক পুরাতনপন্থী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে, তাহাদের সঙ্গে এই প্রগতিশীল শিক্ষার তুলনা করিলে নূতন শিক্ষার অনুকূলেই ফলাফল দেখা যাইবে।

সর্বপ্রথম এই ফলাফল বিচার করা হয় বোধ হয় ইলিনয়-(Illinois) এর উইনেট্কা (Winnetka)-তে, সিকাগো (Chicago)-র উপান্তে। প্রায় ত্রিশ বৎসর আগে তাঁহারা রীতিমত গবেষণা আরম্ভ করিলেন। মাননির্ণায়ক পরীক্ষা (standardised test) ব্যবহার করিলেন ছেলেদের কৃতিত্ব দেখিবার জন্য। প্রায় সর্বক্ষেত্রেই তাহারা যে অগ্রগামী তাহা

বুঝা গেল। দেখা গেল, উইনেট্‌কা (Winnetka)-তে যে রকমের ছাত্রসমাবেশ হয় তাহারা সকলে শিক্ষিত পরিবার হইতে আসে—অর্থাৎ যেখানে অভিভাবকদের সমাজের অন্যান্য দলের অপেক্ষা শিক্ষাদীক্ষার সুযোগ অনেক বেশি ঘটিয়াছে। ফলে দুইটি ব্যাপারে এই সব ছেলেরা লাভবান হয়—ভ্রমণের অভিজ্ঞতা, এবং প্রচুর পুস্তকাদি পাঠের সুযোগ।

এই সময়ে অন্য তিনটি অঞ্চলে, যেখানে উইনেট্‌কা (Winnetka)-র মত অধিবাসী ছিল, আর তিনটি স্কুল চলিতেছিল। কিন্তু তাহাদের কার্য এবং শিক্ষাপদ্ধতি পুরাতন প্রথায় চলিতেছিল।

সুতরাং বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া উইনেট্‌কা (Winnetka)-র স্কুলের ফলাফলের সঙ্গে এ তিনটির তুলনা করা হইত। এবং প্রতি বৎসরেই দুই একটি বিষয়ে একটু আধটু ছাড়া উইনেট্‌কার পাবলিক স্কুলের ফলাফলের উৎকর্ষের ব্যতিক্রম হইত না—বিশেষ বিষয়ে যেমন ইংরাজী, অঙ্ক, ইতিহাস, বিজ্ঞান এবং ভাষা ইত্যাদিতে।

সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই ছিল যে উইনেট্‌কার ছাত্রদের একটি বড় অংশ সর্বদাই নানা স্কুলের অধীন বিভিন্ন ক্লাব বা সংঘ পরিচালনা করিত। গানে, অভিনয়ে, খেলায়, প্রকাশনে (publication) উইনেট্‌কার অংশগ্রহণ অন্যদের তুলনায় অনেক অধিক ছিল, খেলাধূলার প্রতিযোগিতায়ই বা কম কিসে? ছাত্রসমিতিতে কম করিয়াও অন্ততঃ শতকরা পঞ্চাশ জন

উইনেট্‌কার ছাত্র ছিল, এবং অন্যান্য স্কুলের তুলনায় শতকরা একশত জন বেশি ছিল, স্কলাসটিক অনার সোসাইটিতে (Scholastic Honour Society) নেতৃত্ব বিষয়ে ইহারা অগ্রগণ্য ছিল। সংগঠন বা কার্যকরী সমিতির সভ্য হইয়া খেলাধূলায় ছাত্রশাসন-সভার প্রতিনিধিরূপে সকল কার্যকলাপেই ইহারা ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

এই তো গেল কোন বিশেষ অঞ্চলের কথা। ইহার পর দেশের বহু স্থানে বহু গবেষণা হইয়াছে। নানা কাগজে, পত্রিকায়, বই-এ প্রগতিশীল শিক্ষার জয়গান ঘোষিত হইতে লাগিল। পাঠ্য বিষয়ে ইহার উৎকর্ষের দাবি যদি ছাড়িয়া দেওয়াও হয়—অর্থাৎ যদি মনে হয় যে জ্ঞান বিষয়ে উভয় স্কুলেই একই রকমের ফলাফল দেখা যায়—তবুও জীবনের ও সমাজের কতগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ে এই শিক্ষার উৎকর্ষ প্রমাণিত হইয়াছে। মানুষের যেখানে ব্যক্তি ও সমাজ সম্পর্কিত ব্যাপারে বিশেষ যোগ্যতার প্রয়োজন—যেখানে অনুভূতি ও বোধের ক্ষমতাকে তীক্ষ্ণ করিতে হয়, যেখানে চাই আগ্রহ, চাই উৎসাহ, চাই চরিত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য এবং সর্বোপরি চাই বিশেষভাবে নেতৃত্বের অসাধারণ গুণ—সেই সব ক্ষেত্রে প্রগতিশীল শিক্ষা সমাদৃত হইল। এই সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ যে গবেষণা হইয়াছে তাহাকে "অষ্টবর্ষীয় গবেষণা" (১৯৩২—১৯৪০) বলা হয়।

বিভিন্ন আকার ও প্রকারের ত্রিশটি স্কুল লওয়া হইল এই

গবেষণার উদ্দেশ্যে। স্থির হইল যে প্রায় সকল কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় পাঁচ বৎসর কালের জন্য পরীক্ষার ফলাফল ছাড়াই স্কুলের ছাত্রদের ভর্তি করিবে। তাহারা কি পড়িয়াছে, অথবা কি জানে, সে বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া কেহ মাথা ঘামাইবে না, কেবলমাত্র যোগ্যতার নিদর্শন স্বরূপ স্কুলের কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে অনুমোদনপত্রের ও ছাত্রদের নিজেদের রিপোর্ট হইলেই চলিবে।

কয়েক সপ্তাহব্যাপী প্রিন্‌সিপাল ও হেড্‌মাস্টারদের অধিবেশন চলিল, অধিবেশনে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়া হইল। স্থানে স্থানে কি ভাবে শিক্ষাব্যবস্থায় উন্নতি আনা যাইতে পারে তাহার গবেষণা চলিল। উন্নততর পরিকল্পনা তৈয়ারী হইতে লাগিল। কেহ বা আবার পুরাতন প্রথাকে একেবারে বিসর্জন দিতে পারিলেন না; তাহার উপর একটু ঘষামাজা চলিতে লাগিল।

প্রথম তিন বৎসর পরিকল্পনা অনুযায়ী ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া হইল। পরের পাঁচ বৎসরে তাহারাই নানা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিল। পুরাতন প্রথায় শিক্ষিত দল বিশ্ববিদ্যালয়ে Control group-এর পর্যায়ভুক্ত হইল, এবং এই ত্রিশটি স্কুলের যে ছাত্র, তাহাদের লইয়া experimental group গঠিত হইল। ইহাদের সমমান করিবার জন্য উভয় দল হইতেই প্রতি দুইটি শিক্ষার্থীকে একই বয়স ও বুদ্ধিমাপ অনুসারে বাছিয়া লওয়া হইল, পারিবারিক আয় ও সাংসারিক

অবস্থা অনুরূপ দেখিয়া। অত্যন্ত যত্ন সহকারে এই সমকক্ষতা রক্ষা করা হইল। যদিও কোন দুইটি শিক্ষার্থী সকল রকমে একপ্রকারের হইতে পারে না, তবুও ১৪৭৫ জোড়ার মধ্যে সে প্রভেদ নামমাত্রই হইবে বলিয়া আশা করা গেল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অধ্যাপকদল ছাত্রদের পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, নানারকম 'মাননির্ণায়ক' (standardised test) পরীক্ষা নেওয়া হইল। ক্লাশে যোগ্যতা বিবেচনা করা গেল, কিন্তু ইহাতেই সব ক্ষান্ত হইল না। কে বেশি উৎসাহী ছিল, কে বেশি কর্মপটু, কাহার মধ্যে নেতৃত্বের গুণ রহিয়াছে, অবসর সময় কে সর্বাপেক্ষা ভালভাবে ব্যবহার করিয়াছে—অর্থাৎ প্রকৃত লাভজনক ও কার্যকরী শিক্ষা কাহাদের হইয়াছে এই সব বিষয় বিচার করা হইল।

ফলাফল নির্ধারণ করিতে দেরী হইল না, পাঠ্যজ্ঞান সম্বন্ধে উভয় দলের মধ্যে বিশেষ তারতম্য লক্ষ্য করা গেল না, কিন্তু কতগুলি ব্যাপারে ইহাদের উৎকর্ষ প্রমাণিত হইল। যেমন বুদ্ধিমত্তা, জ্ঞানপিপাসা, কর্মদক্ষতা, সুন্দর ও পরিষ্কার চিন্তাধারা, কাজে উৎসাহ, সুষ্ঠুভাবে কাজ সম্পন্ন করিবার উপায় উদ্ভাবন এবং সর্বোপরি তাহাদের নেতৃত্ব অত্যন্তই প্রশংসনীয়। দেখা গেল যে সম্মাননীয় সকল পদে প্রগতিশীল ছাত্রদেরই মনোনীত করা হইয়াছে।

আবার ত্রিশটি স্কুলের মধ্যে অপেক্ষাকৃত খারাপ এবং অপেক্ষাকৃত ভাল স্কুলের তুলনা হইল। সাধারণ মানের

(average standard) স্কুলে বিশেষ প্রভেদ দেখা গেল না, কিন্তু ভাল স্কুলে বোঝা গেল প্রভেদ কোথায়। সুতরাং আট বৎসরের গবেষণায় নূতন শিক্ষার মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত হইল।

অষ্টম অধ্যায়

ইহার এত সমালোচনা কেন ?

কিন্তু কেন এত সমালোচনা ? কেনই বা এই সন্দেহ ? ইহার কারণ তিনটি। প্রথম, চরমপন্থীদের উগ্র মতামত ; দ্বিতীয়, গণতন্ত্রে অবিশ্বাস ; এবং তৃতীয়, প্রকৃত জ্ঞানের অভাব।

ইতিহাসে দেখা যায়, যে কোনরকম পরিবর্তনের মূলেই বাধা। সক্রেটিস্ গ্রীক্‌দের চিন্তাধারায় যে আলোড়ন আনিলেন তাহার শাস্তিস্বরূপ তাঁহাকে বিষপান করিতে হয়। যীশুখৃস্ট ক্রুশবিদ্ধ হইলেন—কারণ তাঁহারই প্রচারিত বাণীতে বহুযুগের প্রতিষ্ঠিত নিয়মের ভিত্তি নড়িয়া উঠিল। পূর্বে লোকের ধারণা ছিল পৃথিবীটা চ্যাপ্টা এবং বিশ্বজগৎ পৃথিবীর চারিদিক ঘিরিয়া ঘুরিতেছে ; ব্রুনো ইহার প্রতিবাদে নিজের সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিলেন—ফলে তাঁহাকে পোড়াইয়া মারা হইল।

যুক্তরাষ্ট্রে ক্রমশঃ পরিবর্তনের আঘাত সহ্য করিবার অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে ক্রমাগত পরিবর্তন আসিতেছে, ফলে পথের বাধা ক্রমশঃ কম হইয়া দেখা দিতেছে। কিন্তু সামাজিক কোন বিধিব্যবস্থার পরিবর্তনের কথা উঠিলে ঠিক তাহার বিপরীত হয়। জনসাধারণ পাবলিক স্কুল প্রতিষ্ঠার

বিরুদ্ধে প্রথম হইতেই উত্তেজিত ; পাবলিক লাইব্রেরীর (পাঠাগার) পরিকল্পনা কিংবা ট্রেড ইউনিয়ন কিংবা এই ধরণের কোন কিছু নূতন প্রথা প্রচলনের সময়ে দেশবাসী দলবদ্ধ হইয়া বিরোধিতা করে। পদার্থবিজ্ঞানের যে এত উন্নতি সম্ভব হইয়াছে—তাহার কারণ এই বিষয়ে জনসাধারণের প্রতিবন্ধকতা কমিয়া গিয়াছে। ফলে লোকে পাইয়াছে সুখ ও আরাম এবং সুযোগ ও সুবিধা। সমস্ত বাস্তবজগৎকে তাহারা এক সূত্রে বাঁধিয়াছে। এখন বিশ্বের জনসমাজে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করিবার পথে যদি কোনপ্রকার প্রতিবন্ধকতা উপস্থিত হয়—তবে বুঝিতে হইবে বস্তুজগতের এই সর্বাঙ্গীণ উন্নতি বিরাট মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংসের পথে টানিয়া লইবার জন্য পা বাড়াইয়াছে।

এই পরিস্থিতি হইতে বুঝা যাইতেছে যে উগ্র গোঁড়ামির মনোভাব—শিক্ষার ক্ষেত্রে যে কোনরকম পরিবর্তনকে নিশ্চয়ই বাধা দিবে। কারণ শিক্ষকদের প্রায় সকলেই পুরাতন পদ্ধতিতে পড়াশুনা করিয়াছেন। তাঁহাদের শিক্ষার প্রণালীও সেইরকম পুরাতন ; তাঁহারা জীবনে প্রতিষ্ঠিতও হইয়াছেন সেইভাবে ঐ অবস্থার মধ্যে। সুতরাং যে জিনিসের সঙ্গে তাঁহাদের শিক্ষা-দীক্ষা, জীবনধারণ এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত রহিয়াছে—তাহা সহসা বদলাইয়া দেওয়া তেমন সহজ নহে।

পিতামাতা এবং অভিভাবকদের সম্বন্ধেও এই কথাই খাটে। যখনই কোন নূতন নিয়ম প্রবর্তিত হয় তখনই ছেলেমেয়েদের

শিক্ষা অর্জন সম্বন্ধে তাঁহারা প্রায়ই সন্দিহান হইয়া পড়েন—তাঁহারা যাহা দেখেন নাই, যাহা শোনেন নাই—নিজেদের অবস্থা হইতে যাহার এত প্রভেদ সে সমস্ত কি করিয়া তাঁহারা রাতারাতি গ্রহণ করিতে পারিবেন? "হয়ত ছেলেরা আমাদের মত উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতে পারিবে না"—ইত্যাদি অমূলক দুর্ভাবনায় তাঁহারা পীড়িত হইয়া পড়েন।

লোকের মনোগত এই দৃঢ় আপত্তিকে ভালভাবে বুঝিতে হইবে—দেখিতে হইবে ইহা যেন উন্নতির পথে অন্তরায় না হয়। সৌভাগ্যের কথা এই যে, মানুষের অন্তরে রহস্য সন্ধানের ক্ষুধা চিরন্তন। ইহা বাধা পাইলে অধিকতর তেজে অগ্রসর হইতে চায়। পিতামাতার ইচ্ছা এই যে ছেলেমেয়েরা যেন তাঁহাদের অপেক্ষা ভাল শিক্ষা পায়—তাঁহাদের অবস্থার চাইতে ভাল অবস্থায় যেন তাহারা সুখে থাকে। এই ইচ্ছা যখন প্রবল হয় তখন পূর্বের সুদৃঢ় মতামত হার মানিয়া যায়, গোঁড়ামির প্রাচীর ধ্বসিয়া পড়ে—উন্নতির আলোয় দিক্‌চক্রবাল উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

দ্বিতীয় কারণ—মানুষের মনের অন্তস্তলে গণতন্ত্রের প্রতি এক গভীর অবিশ্বাস রহিয়াছে। সকল লোক সব কিছু জানিবে, সকল সমস্যার সমাধান খুঁজিবে—ইহা কি করিয়া সম্ভব? ছোট যাহারা তাহারা কি করিয়া ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে, ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এত কথা ভাবিতে পারিবে? এই সকল সন্দেহে মানুষের মন পীড়িত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সমস্যা যত জটিল হইয়া মানুষের সম্মুখে

উপস্থিত হইবে ততই চতুরতার সঙ্গে তাহার সমাধানের উপায় সন্ধান করা মানুষের স্বভাব।

মানুষের প্রতি, মানুষের ক্ষমতার প্রতি তথা গণতন্ত্রের প্রতি যদি এইরূপ অবিশ্বাস থাকিয়া যায় তবে আন্তর্জাতিক শিক্ষা কি করিয়া সম্ভব?

তৃতীয়তঃ, প্রগতিশীল শিক্ষা কাহাকে বলা হয় তাহা অধিকাংশ লোকে জানে না। সুতরাং ছাত্রের পিতামাতা কিংবা অভিভাবককে দোষ দেওয়া উচিত নহে; দোষ আমাদের শিক্ষকদের। সমাজের লোকের সঙ্গে সংযোগ রাখিতে এবং জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আদানপ্রদান করিতে তাঁহারা অক্ষম হইয়া পড়িয়াছেন। আজকাল লোকের কাছে ভাষণদানের কোনই মূল্য নাই। এ কথা জানিয়াও শুধু কথা বলিয়া অন্যকে বুঝাইবার বা প্রভাবিত করিবার চেষ্টা করিলে সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। অভিভাবকেরা যখন জানেন না 'প্রগতিশীল শিক্ষা' কি, ঐ পদ্ধতিতে ছাত্রেরা সমস্ত জিনিস অভিজ্ঞতার পথেই শিখিতেছে—এ কথা অভিভাবকেরা যদি না জানিতে পারেন, তবে একমাত্র শিক্ষকদেরই তাহা বুঝাইয়া দেওয়া সম্ভব।

অন্য সমস্ত ব্যবসা এবং জীবিকা নির্বাহের বিষয় বুঝাইতে যেমন পৃথক পৃথক শব্দমালার প্রয়োজন হয়—শিক্ষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তদ্রূপ। কোন কিছু বুঝাইতে হইলে যদি দুর্বোধ্য ভাষার ব্যবহার করিতে হয় তবে কাজ চলিবে কি করিয়া? অথচ কোন বিষয় সম্বন্ধে যদি কাহারও সাধারণ জ্ঞান না থাকে—

তবে তাহাকে বিষয়টি সম্পূর্ণ বুঝাইতে অসুবিধা হইবে বই কি। 'Integration' অথবা 'core-curriculum' ('কোর-কারিকুলাম'), 'group dynamics' (গ্রুপ-ডাইনামিক্‌স্) ইত্যাদি শব্দের তাৎপর্য বুঝিয়া লইতে শিক্ষাবিভাগের লোকদের অসুবিধা না হইতে পারে। কিন্তু যাঁহারা এইসব কথার তাৎপর্য জানেন না, সেরূপ অভিভাবকদের এইরূপ শব্দমালার মাধ্যমে প্রগতিশীল শিক্ষার অর্থ বুঝাইতে চাহিলে কি লাভ হইবে ?

অনেক বিশেষজ্ঞ আছেন যাঁহাদের বলিবার বা লিখিবার এরূপ দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও কার্যক্ষেত্রে কোন বিশেষ ভাবকে তাঁহারা এত জটিল করিয়া তোলেন যে মনে হয় প্রগতিশীল শিক্ষায় আর সবই থাকিতে পারে—নাই কেবল শিক্ষা। পুরাতন শিক্ষায় শাসনে কঠোরতার বিরুদ্ধে হয়ত বক্তা এমনভাবে কথা বলিলেন যে মনে হইল নূতন স্কুলে যেন সব ব্যবস্থাই নিয়ন্ত্রণ-বিহীন, ছাত্রেরা যেমন ইচ্ছা তেমনভাবে চলিতে পারে, ছাত্রের নিজের খেয়ালমত চলিতে বাধা নাই। স্কুলের সমস্ত কিছুই যেন খেলা আর খেলা।

অনেকে নিজেদের ভিন্ন ভিন্ন মতবাদের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে নূতন শিক্ষার বিষয় এমনভাবে বলিয়াছেন যে শ্রোতাদের মনে হয় যে এই শিক্ষাব্যবস্থায় কেবল মিথ্যা বাগাড়ম্বর ছাড়া আর কিছুই নাই। ইহা আপন কার্যসিদ্ধির উপায় মাত্র; নূতন শিক্ষার ব্যাপারে এক প্রকারের পাগলামির পরিচয় পাওয়া যায়। কোন অঞ্চলে কোন স্কুল, অথবা কোন স্কুলে কোন

শিক্ষক এমন সব উগ্র মতবাদ পোষণ করেন কিংবা এমন খামখেয়ালীভাবে কার্য পরিচালনা করেন—যাহাতে প্রগতিশীল শিক্ষার সঠিক রূপ বোঝা যায় না—উপরন্ত অন্যেরা হয়ত উহাকেই শিক্ষার আদর্শ বলিয়া ভুল করেন।

এই শিক্ষা সম্বন্ধে কতকগুলি দোষারোপ করা হয়। কেহ বলে প্রগতিশীল শিক্ষা সাম্যবাদের পক্ষপাতী ; কেহ বলে বিপ্লবের বীজ এই শিক্ষাতেই রহিয়াছে ; কেহ বা বলে ইহা রাজতন্ত্রবাদী, আবার কেহ বলে ইহা সমাজতন্ত্রবাদী। ইহা কম্যুনিস্টপন্থী হইতেই পারে না, কারণ গণতন্ত্রের পদ্ধতিতে সবাইকে ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশ করিবার পূর্ণ স্বাধীনতা এস্থলে দেওয়া হইয়াছে। ইহা বিপ্লববাদী—একথাও ভুল। কারণ পরস্পরের প্রতি হৃদ্যতা বজায় রাখা, যুক্তি বিচারের পথে সমস্ত সমস্যার সমাধান করা, ব্যক্তির সম্মান করা, জাতিধর্মের বৈষম্য ভুলিয়া যাওয়া—ইহা কেবল নূতন শিক্ষাতেই সম্ভব। আবার প্রতিবেশী দেশবিদেশের অধিবাসীদের পরিচয় জানা, তাহাদের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতির প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করা, তাহাদের দাবি-দাওয়াকে সমভাবে স্বীকার করিয়া লওয়া—এই সব হইল প্রগতিশীল শিক্ষার উদ্দেশ্য। অতএব ইহাতে রাজতন্ত্রেরই বা স্থান কোথায়?

অনেকে মনে করেন যে নূতন শিক্ষায় 'সমাজ-শিক্ষার' বিশিষ্ট স্থান রহিয়াছে এবং ছাত্রকে সামাজিকতায় অভ্যস্ত করিয়া তোলা হয়—অতএব শিক্ষার নীতিও হয়ত

'সমাজতন্ত্রবাদ'। ইঁহারা ভুলিয়া যান যে 'সমাজশিক্ষা' বলিতে ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, বিজ্ঞান, এমন কি মানববিজ্ঞান (anthropology)—সমস্ত এক সঙ্গে বুঝায়। আর সামাজিকতা পাঁচজনের সহিত মেলামেশা চলাফেরা করিবার উপযোগী একপ্রকারের নিপুণতা ও সহনশীলতা।

কিন্তু শিক্ষকেরা সমাজতন্ত্রবাদী—কেহ কেহ বলেন। স্বীকার করা গেল যে শিক্ষকেরা গণতন্ত্রবাদীও বটেন, প্রজাতন্ত্রবাদীও বটেন। শিক্ষক সকলকে তাহাদের নিজ নিজ মতামত গঠন করিতে সাহায্য করিয়া থাকেন। এইখানেই হয় বিপদ। ছেলেমেয়েরা এই রকম শিক্ষা পাইয়া পিতামাতা এবং অভিভাবকের সঙ্গে নানা আলোচনা এবং যুক্তিতর্কে উৎসাহিত হইয়া ওঠে, ফলে অভিভাবকদের নূতন শিক্ষার প্রতি আস্থা চলিয়া যায়।

মনে রাখিতে হইবে প্রগতিশীল শিক্ষা কোন রাজনৈতিক অথবা অর্থ নৈতিক মতবাদ নহে। শিক্ষাই ইহার ধর্ম ও কর্ম। মানবশিশুর জীবন-অঙ্কুর উদ্গমের ইহা কেবল সহায়ক। সমাজের দায়িত্বশীল ব্যক্তি বলিয়া সে যেন সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে ইহাই এই শিক্ষার উদ্দেশ্য। বিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞান সম্মত প্রথায় উত্তম শিক্ষার ব্যবস্থা আছে কেবলমাত্র এই নূতন শিক্ষায়।

অনেকে বলেন—প্রগতিশীল শিক্ষায় ধর্মকে নির্বাসন দেওয়া

হইয়াছে। কি প্রগতিশীল শিক্ষা, কি পুরাতন শিক্ষা—কোন ব্যবস্থাতেই স্পষ্টভাবে ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। তবে মানুষ হিসাবে প্রতি শিক্ষকেরই ধর্মভাব এবং ভগবানে বিশ্বাস রহিয়াছে বলা যায়। সুতরাং 'নাস্তিকতা' শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব নূতন শিক্ষার নহে।

ইহা ছাড়াও কতগুলি অসুবিধা রহিয়াছে। দেশের সব ছেলেমেয়েরা বয়সের "মানের উর্ধ্বে" (above standard) থাকিতে পারে না। সন্তানের অসাফল্যে পিতামাতার লজ্জা ও অপমানবোধ হয়। ইহাতে তাঁহারা না পারেন ছেলেমেয়েদের দোষ দিতে, না পারেন নিজেদের দায়ী করিতে। অবশেষে দোষ দেওয়া চলে শিক্ষাব্যবস্থাকে। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে ছেলেদের প্রত্যেকের নিজস্ব ক্ষমতা অনুযায়ী কাজ এবং পড়ার ব্যবস্থা এইখানে রহিয়াছে, কাজেই পক্ষপাতিত্বের যেমন প্রশ্ন আসে না, তেমন অন্য কোন কিছুর উপর দোষারোপ করাও নিষ্প্রয়োজন।

কোন কোন ক্ষেত্রে শিক্ষকের ত্রুটিও রহিয়াছে। মানুষ-মাত্রেরই ভুল হইবার সম্ভাবনা আছে। যে কোন রকমের যে কোন স্কুলেই শিক্ষকের ভুল হওয়া অস্বাভাবিক নয়। সেক্ষেত্রে দলের পরিবর্তে ব্যক্তিবিশেষকে দোষ দেওয়া যাইতে পারে। এইরূপ বিশেষ কোন ত্রুটির আলোচনা না হইয়া শিক্ষার সব কিছুর প্রতি দোষারোপ করা হয়।

ভাল শিক্ষার জন্য অর্থব্যয় থাকিবেই। দেখা যায়, যে

সমস্ত অভিভাবকের দল নানাবিধ কর বা ট্যাক্স দিতে আপত্তি করেন তাঁহারাই এই শিক্ষার বিরোধী।

তাহা ছাড়া অযৌক্তিক যুদ্ধং দেহি ভাবও রহিয়াছে। অনেকে একটু যশের আশায় কিংবা অর্থের লোভে, অথবা কোন রকম প্রতিশোধ বা জিদের বশে এই নূতন শিক্ষার নিন্দা অপবাদ করিতেছেন। কোন জায়গায় একটু বাষ্প উদ্গীরণের আভাস পাইলেই নিন্দুকেরা যত্ন করিয়া সেই আগুন বাড়াইতে প্রয়াসী হন। ভুল বুঝিবার ফলে এ সব হইয়া থাকে। প্রত্যেক অভিভাবকই ছেলেমেয়ের শুভকামনা করেন। এই শিক্ষার মাহাত্ম্য আজকাল অনেকেই বুঝিতেছেন। পূর্বের জড়তা ও অবিশ্বাস চলিয়া যাইতেছে। মানুষের শিক্ষার উন্নতিতে যত্নবান হইয়া দলবদ্ধ ভাবে মার্কিনবাসী আজ শিক্ষার উন্নয়নে উৎসাহী হইয়াছে।

নবম অধ্যায়

সন্তানের প্রতি কর্তব্য

যাঁহারা পুরাতন শিক্ষায় মানুষ, আজকালকার নূতন প্রগতিশীল বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েদের পড়ান তাঁহাদের কাছে একটা সমস্যার মত। তাঁহাদের পড়াশুনার ধরণধারণ সবই ভিন্ন ছিল। তাঁহারা স্কুলের শেষে বাড়ীতেও অধ্যয়নে রত থাকিতেন। নূতন স্কুলের ছেলেমেয়েদের কখনও সেরকম করিতে তাঁহারা দেখেন না। যে পদ্ধতিতে তাঁহারা পড়িতে বা অঙ্ক কষিতে শিখিয়াছিলেন নূতন পদ্ধতিতে সেই সব নাই। কিন্তু পড়াশোনাতে যথাযথ সাহায্য করিতে তাঁহারা চাহেন না, এমন নহে। যে অভিভাবক যতটুকু পারেন সাধ্যমত ততটুকু করিবার জন্য তিনি যথেষ্ট আগ্রহশীল।

প্রগতিশীল শিক্ষাকে সফল করিতে হইলে যেমন প্রগতিশীল স্কুল চাই তদ্রূপ পরিবারের আবহাওয়া অনুকূল হওয়া চাই। প্রথম সূত্রস্বরূপ প্রত্যেক ব্যক্তির সম্মান রক্ষা করিয়া চলা একটা বড় জিনিস। ছোট-বড়, যুবা-বৃদ্ধ প্রত্যেকের মতের অমিল তো থাকিবেই—তবে তাহা লইয়া বিবাদে লাভ নাই। স্ব স্ব মতামত ব্যক্ত করিবার সকলের সমান অধিকার থাকিবে, তেমনই মতের অনৈক্যকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের সহিত

বুঝিতে এবং জানিতে হইবে। সংসারে শিশুর সর্বাধিক প্রয়োজনীয় দাবি হইতেছে—ভালবাসা পাওয়া ও নিরাপত্তা সম্বন্ধে আশ্বস্ত হওয়া। অবহেলা তাহার সহে না—পরিবারের সকলের মধ্যে একটি স্থান পাইবার অধিকার সে রাখে। "আমিও পরিবারের একজন, সকল ব্যাপারে আমারও বলিবার এবং করিবার কিছু আছে"—এই বোধ এবং আশ্বাস যেন সে পায়।

সাধারণতঃ আমাদের পরিবারে ছোটদের যথার্থ কোন আমল দেওয়া হয় না। কোন কাজে বা কথায় ছোটদের 'করা' বা 'বলাকে' কেহ বিশেষ গ্রাহ্য করে না। হয়ত, তাড়াতাড়ি কোন কাজ করিতে হইবে, তখন জনে জনে প্রত্যেকের, বিশেষ করিয়া বাড়ীর ছোটদের পরামর্শ লইবার কথা কাহারও খেয়াল থাকে না। কিন্তু সমস্ত খুঁটিনাটি ব্যাপারে সকল সময়ে যদি ছোটদের অংশ লইতে দেওয়া হয়—যদি তাহাদের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করা হয় এবং শিশু যদি বোঝে যে তাহার কথার মূল্য আছে তবে সমানভাবে সে অনেকখানি দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারে, সমস্ত কিছুতে একটা অর্থও খুঁজিয়া পায়। মা-বাবার অভিজ্ঞতা হইতেও তাহারা অনেক কিছু শিখিতে পায়। ফলে মা-বাবার উপর সর্বদাই নির্ভরশীল হইয়া থাকে না, দায়িত্বপূর্ণ কোন কাজে অংশগ্রহণে অনিচ্ছুক হয় না। মা-বাবা নিজেদের অভিজ্ঞতার অংশ যতটা ছেলেমেয়েদের দিবেন—ছেলেমেয়েও সেই অনুপাতে নিজেদের

অভিজ্ঞতার অংশী বলিয়া মা-বাবাকে গ্রহণ করিবে। পারিবারিক বন্ধনও এইভাবেই গড়িয়া ওঠে।

ছেলেমেয়েরা আমাদের মতই তীক্ষ্ণভাবে নানা চিন্তা ও বিচার করিতে থাকে। তবে প্রভেদ এই যে তাহাদের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার আবির্ভাব হওয়া সম্ভব নহে। এই ক্ষেত্রে বড়দের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছোটদের সাহায্য করিতে সক্ষম হইবে। কোন কোন সময়ে অতি দ্রুত চিন্তার দ্বারা কোনরূপ সমস্যার সমাধানে পৌঁছিতে হয় বা উপায় ভাবিতে হয়। কিন্তু সে বিষয়ে ছেলেমেয়েদের যদি পরিষ্কার-ভাবে কোন কথা না বলা হয়—তাহাদের সঙ্গে আলোচনা করিবার অবকাশ না মেলে, তাহাদের অজ্ঞানতার সুযোগে তাহাদের অগোচরে কোন কাজ করা হয়, সেস্থলে স্বাস্থ্যকর পারিবারিক আবহাওয়া আসিতে পারে না।

সন্তান যদি বয়সে অত্যন্ত ছোট হয় তবে তাহাকে কোন কঠিন সমস্যার সম্মুখীন করার অর্থ হয় না। তাহার বুদ্ধি ও বোধশক্তির স্তরে নামিয়া তাহাকে এমন ভাবে বুঝাইতে হইবে যেন নিজে হইতেই সে সহজভাবে বুঝিয়া লইতে পারে।

এই সম্বন্ধে ওয়াশবার্নের একটি মজার গল্প আছে। তাঁহার ছোটবোনকে মা যখন স্নান করাইতেন সেই শিশুর ছোট ছোট গোলাপী আঙ্গুলগুলি ভাইকে প্রলুব্ধ করিত। সে বোনকে অবশ্যই ভালবাসিত—কিন্তু স্নানের শেষে প্রতিদিন বোনের পায়ের আঙ্গুলে কামড় দিবার লোভ সংবরণ করিতে

পারিত না। ছোট শিশুটি চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিত। একদিন স্নান করাইবার সময় মা ছেলেকে নিজের পায়ের আঙ্গুল কামড়াইতে বলিলেন। তখনই প্রথম ছেলে বুঝিতে পারিল কামড়াইলে কেমন ব্যথা লাগে। বকুনি বা শাস্তির আর প্রয়োজন হইল না। শিশুদের সম্মান দেখাইলে তবেই তাহারা অপরকে সম্মান করিবে।

তবে তাহারা কি এই রকম অভিজ্ঞতা অর্জনের পক্ষে নেহাৎই ছোট নহে? কি ধরণের অভিজ্ঞতা তাহাদের সামনে ধরা যায়?

সর্বপ্রথম শিশু অসুবিধা বোধ করে পড়িতে শিখিবার সময়। সময়ে সে তাড়াতাড়ি শিখিতে পারে, সময়ে দেরিও হইয়া থাকে। প্রগতিশীল স্কুলে শিশু পড়িবার আগ্রহ বা ইচ্ছা যতদিন না প্রকাশ করিবে, ততদিন তাহাকে জোরজুলুম করা হয় না। না হয় আট বছর বয়স পর্যন্ত পড়িতে নাই বা শিখিল—ইহাতে কোনই অসুবিধা হয় না। পরে যে উৎসাহ এবং আগ্রহ তাহাকে পীড়ন করে, তাহার কল্যাণে সময়ের ক্ষতিপূরণ হইয়া যায়। তাহার অনিচ্ছাতে তাহাকে শিখিতে বাধ্য করিলে যেমন নিরুৎসাহ তেমনি জিদ তাহাকে পাইয়া বসে। ফলে পড়াশুনার প্রতি চিরদিনের মত তাহার অরুচি জন্মে।

এইরূপ ক্ষেত্রে অভিভাবকদের কর্তব্য কি? ছেলে কিংবা শিশুদের উপর চাপ দিবার কোন অর্থ হয় না। উর্ধ্বপক্ষে

এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, শব্দেরও আবার অর্থ আছে। অথবা তাহাদের কাছে গল্প পড়িয়া শোনানোর ভিতর দিয়া কিংবা সঙ্গে লইয়া বেড়াইবার কালে জ্ঞানের একটি প্রারম্ভিক ভিত্তি গড়িয়া তুলিবার সকলরকম চেষ্টা করা হউক। ছবির বইয়ের সাহায্যে বেশ ভাল কাজ হইতে পারে। বই পড়িতে পারার যে আনন্দ আছে—এ ধারণা তাহাদের মনে আসিলেই আর ভাবনা করিতে হইবে না। বাকিটুকু স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্র স্বয়ং দেখিয়া বুঝিয়া লইতে পারিবে। কিছুই তাড়াতাড়ি করিবার প্রয়োজন নাই।

কিন্তু পড়িতে আরম্ভ করিলে আমরা তাহাকে উৎসাহিত করিতে পারি। উৎসাহ দিলে আমাদের কাছে উচ্চ রবে পড়িতে তাহার আগ্রহ বাড়িবে। কোন শব্দ উচ্চারণে হয়ত ঠেকিয়া গেল। "ভুল হইতেছে" বলিবার প্রয়োজন নাই। কেবল ঠিক শব্দটি একবার উচ্চারণ করিয়া দিলেই হইল। আপনা হইতেই ঐ জিনিস বারে বারে পড়িবার এবং ঠিকভাবে শিখিবার আগ্রহ শিশুর মনে জাগিবে। এইভাবে উহার সঙ্গে খেলা করা যায়। মূলকথা এই যে, শিশুর যেন যথেষ্ট অভ্যাস হইয়া যায়। আমাদের আগ্রহ উহার উৎসাহ বাড়াইবে।

এখন এই সময়ে কি রকমের বই শিশুর হাতে দেওয়া চলিতে পারে? এক্ষেত্রে সাবধানতা ও সতর্কতার প্রয়োজন। কোন কঠিন পাঠ্যবিষয় মোটেই দেওয়া উচিত নহে। 'হাসির বই' সম্বন্ধে নানা মত আছে। কিছুটা পড়িলে ক্ষতি নাই, কতকগুলি

পড়িয়া আলোচনা করিলে আনন্দ যথেষ্টই পাওয়া যাইবে। পড়িতে সহজ অথচ আগ্রহ-উদ্দীপক সুন্দর বাঁধান বই এই বয়সের শিশুর 'সাথী' স্বরূপ।

পড়ার পরেই 'লেখা'। প্রগতিশীল স্কুলে ছাপার অক্ষরে লেখা অভ্যাস করান হয়। সময় সময় মাতাপিতা এই ভাবিয়া অধীর হইয়া উঠেন যে কখন ছেলেমেয়েরা পাকালেখা শিখিবে। দেখা গিয়াছে যে, ছাপার মত লেখাতে, লেখার অভ্যাস সমান-ভাবেই দ্রুত হয়—বরঞ্চ সেই লেখা পড়িতে সহজ ও সুবিধা হয়। সুতরাং তাড়াতাড়ি পরিবর্তনের কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। মনের ভাবকে কাগজে-কলমে পাঠের উপযুক্ত করিয়া লেখাই হইল আসল কথা।

ছেলেরা লিখিতে শিখিয়া অত্যন্ত উৎসাহী হইয়া পড়ে। যেখানে সেখানে যখন তখন লেখা একটা খেলা হইয়া দাঁড়ায়। সেই সময়ে বাধা দেওয়া উচিত নয় অথবা লিখিতে বাধ্য করাও উচিত নয়। সর্বদা বানান ভুল দেখাইয়া শিশুকে নিরুৎসাহ করা বাঞ্ছনীয় নহে। যদি কোন মারাত্মক ভুল হয়—তবে বড় জোর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া, সে কি লিখিতে চাহিয়াছে তাহা জানিয়া ঠিক লেখা দেখান যাইতে পারে। "ওঃ! এই কথা! তা, লোকে ওটাকে এরকমভাবে লেখে।"—বলিয়া শুদ্ধ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

প্রথম প্রথম শিশু যখন শব্দ বা অক্ষর লিখিতে শিখিল তখন বানান ভুল হইলেও তাহা শিক্ষকের দায়িত্বের উপর ছাড়িয়া

দেওয়া ভাল। তাহার অনিচ্ছাতে বানান শুদ্ধ করিবার প্রয়াস না করাই ভাল। দুই তিন বছরের মধ্যে তাহার আগ্রহ বাড়িবে, নিজে হইতেই জানিতে চাহিবে—কি কথা কিভাবে লিখিতে হয়।

ছেলেমেয়েদের বানানভুল একটা সমস্যার মত। অনেক সময়ে অভিভাবকেরা ইহাতে বড়ই বিরক্তি বোধ করেন। শুদ্ধরূপে বানান শিখাইবার অনেকরকম চেষ্টা করা হইয়াছে। মোটের উপর তাহাদের নিজেদের ক্ষমতার উপর ছাড়িয়া দেওয়া ভাল। বিরক্তি প্রকাশে ক্ষতি ছাড়া লাভ হয় না। সময়ে তাহার সঙ্গে বসিয়া একটু চালাকী করিয়া লিখিতে শিখানোতে কাজ দেয়। ধমক দেওয়া অথবা খুঁত বাহির করার পরিবর্তে উৎসাহ জাগানো অধিক ফলপ্রদ।

অঙ্ক শিখিবার সময় বাড়ীর লোকের প্রভাব অত্যন্ত কার্যকরী হয়। তাঁহারা জানেন যে শিশু কোন্ বয়সে কি জিনিস কতটা শিখিতে পারিতেছে। অনেক সময় স্কুলে মানসিক পরিকল্পনা আসিবার আগেই অনেক নিয়ম ও অঙ্কের প্রয়োগ ইত্যাদি শিখাইবার চেষ্টা হয় যাহার ফলে শিশুর মনে চিরদিনের মত আতঙ্ক জন্মে। কাজেই বয়সের সামর্থ্য লক্ষ্য করিয়া তদনুযায়ী খোরাক যোগাইতে কেবল বাড়ীর লোকেরাই সক্ষম হইতে পারেন।

একটা দৃঢ়ভিত্তি গড়িয়া তোলার অর্থ ইহা নহে যে তাহাকে অনবরতই কাজে লাগাইয়া রাখিতে হইবে। অবিরাম কাজে

ঠেলা যেন কখনও না হয়—তাহা দেখিতে হইবে। শিশুদের প্রয়োজন—বাস্তবতার সঙ্গে সংযোগ রাখিয়া সকল জিনিস জানা ও শেখা।

ছেলেরা গুণিতে ভালবাসে। হাতের কাছে ইঁট, পাথর, মার্বেল, বল, কাঁচের টুক্‌রা—যাহা কিছু পায় তাহাই গুণিতে চায়। বাড়ীতে আজ একজন নিমন্ত্রিত আছেন, বা কাল বাড়ীর একজন অনুপস্থিত থাকিবেন—খাবার জিনিসের কতটা বেশি অথবা কতটা কম দরকার—তাহা গুণিয়া বলিতে ছেলেরা ভালবাসে। তবে তাহাদের ইচ্ছা অথবা আগ্রহের বিরুদ্ধে কিছু করা বাঞ্ছনীয় নহে।

টাকা পয়সা খরচ করিতে শিখিবার পরে ছেলেদের হাতে হাতখরচের জন্য পয়সা দেওয়া যাইতে পারে। তাহারা যেমন গুণিতে শিখিবে সেই সঙ্গে ভাবিয়া চিন্তিয়া ব্যবস্থা করিয়া খরচ করিতেও শিখিবে। এই কাজে মা-বাবা অবশ্যই ছেলেমেয়ের সাহায্য করিতে পারেন।

এইবার ধীরে ধীরে ছেলেমেয়েদের দিয়া দোকান হইতে সওদা অথবা বাজার হইতে জিনিস আনাইবার ভরসা করা যাইতে পারে। সংসারের জিনিস বাজার হইতে কিনিতে দিলে শিশু ঐ কাজের মধ্যে দায়িত্ববোধের আনন্দ পায়।

আট নয় বছরের ছেলেদের সংসারের নানা ছোটখাটো দায়িত্ব দেওয়া যাইতে পারে; ছোটখাটো হিসাব, নিজেদের জিনিসপত্র কাপড়জামা সব নিজেরা কিনিয়া লওয়া, এই সব

কাজ ছেলেরা করিতে পারে। ইহাতে যে শুধু হিসাব বা অঙ্কের শিক্ষা হয় তাহা নহে, দায়িত্ববোধের শিক্ষাও হয়।

কোন কোন সংসারে, বাপ বা ভাইয়ের হয়ত চাকরি নাই; এমন দুরবস্থার সময়ে দেখা গিয়াছে মা, বোন বা ছোটরা সবাই মিলিয়া উপার্জন করিতেছে। এগারো বারো বছরের মেয়ে হয়ত পুতুল তৈরি করিয়া বা মায়ের তৈরি খাবার বা আচার বাজারে বিক্রী করিয়া পয়সা রোজগার করিল, তাহা দিয়া সংসারের কত খুঁটিনাটি, নিজের জামা-কাপড় ইত্যাদিও হইতে পারে। শুধু অঙ্কই নহে, সহযোগিতা ও দায়িত্বশীলতার পরিচয় ইহাতে পাওয়া যায়।

মাপজোক এবং পরিমাণ ইত্যাদিও গণিতের অঙ্গীভূত। রান্নাঘরের কাজে সাহায্য করা, কোন্ জিনিসে কতটা মশলার প্রয়োজন, কোন্ জামা তৈরি করিতে কি ধরণের কতটা কাপড়ের প্রয়োজন, এই সমস্ত জিনিস দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা হইতেই তাহারা শিখিবে। শিশু এই ব্যাপারে যখন যে কাজ করিতে চায়—তাহাকে করিতে দেওয়া উচিত। ভুল হইলে দোষ বাহির করিবার আগে বুঝাইয়া দেওয়া ভাল।

আজ যদি আমরা গ্রামের পাশে কোন এক জায়গায় চড়ুইভাতি করিতে যাই—তাহার আয়-ব্যয়, ব্যবস্থা, সে জায়গা কোথায়, কি করিয়া যাইতে হয়, কতক্ষণ লাগিবে ইত্যাদি সমস্ত কিছুই বাড়ীর শিশুদের ভাবিতে এবং করিতে দেওয়া ভাল। দৈনন্দিন কাজে অংশ গ্রহণ করিলে তবেই তাহারা শিখিবে,

যেমন তাড়াতাড়ি তেমনই ভাল করিয়া শিখিবে। ইহাতে অযথা তাড়া দিবার প্রয়োজন নাই। শিশুর যেমন যেমন শিখিবার ইচ্ছা হইতেছে—তদনুরূপ অনুকূল পরিবেশ থাকা ভাল।

কিছু বিজ্ঞানের বিষয়—ইতিহাস, ভূগোল, সমাজশাস্ত্র অথবা নাগরিক বিজ্ঞান—সমস্তই এইভাবে ঐ একই পরিবেশে শিখান যাইতে পারে। শিশুর স্বাভাবিক একটা কৌতূহল আছে। সে জ্ঞানপিপাসু—তাহার আগ্রহের ক্ষুধা মিটাইলেই কাজ ভাল হইবে।

কতশত প্রশ্ন দিনের মধ্যে শিশু করিতেছে, কত জিনিস তাহার জানিবার আছে; জ্ঞানের আরম্ভ এইভাবে। পাশ কাটাইয়া উত্তর না দিবার ইচ্ছা অথবা কোন রকমে তাহাকে শান্ত করিবার চেষ্টা সে সহজেই বুঝিতে পারে, আর ইহা অত্যন্ত ক্ষতিকর। বড় বড় কঠিন তথ্য সে বুঝিবে না। যে জিনিস সে জানে, যে কথা সে বোঝে,—তাহা অবলম্বন করিয়া কত রকম ভাবেই না শিখানো যায়। ভাল ভাল জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই রাখা, বই উপহার দেওয়া অতি উত্তম ব্যবস্থা। দেশ-বিদেশের কাহিনী, জন্তু-জানোয়ারের গল্প, বিজ্ঞানের কথা—নানা জিনিস—যাহা গল্পাকারে শিশুর মনোরঞ্জনের জন্য লেখা হইয়াছে—তাহারই মধ্যে শিশু নিজের রুচি অনুসারে খোরাক যোগাড় করিয়া লইবে। কোথায় কি পাওয়া যায়, কি করিয়া দেশবিদেশে জিনিসের আমদানী-রপ্তানী হয়, ভিন্ন ভিন্ন জিনিস

কিভাবে উৎপন্ন হয়, কেন এবং কি পরিমাণে উৎপন্ন হয়, বিভিন্ন দেশের শাসনব্যবস্থা কোথায় কি রকম—ইত্যাদি গল্পের ছলে নানা জিনিসের সাহায্যে কত রকমভাবে শিশুদের বলা যাইতে পারে।

এমন পরিবার আছে—যেখানে সত্যি মনে হয় যে মা এবং বাবা উভয়েই প্রকৃত কর্তব্য করিতেছেন। যে কয়েকটি ছেলেমেয়ে আছে তাহাদের শিক্ষাব্যবস্থা কেমন সুন্দর। পদ্ধতিটি কেমন চমৎকার। কোথাও বেড়াইতে যাওয়া হইবে, দূরে অথবা নিকটে, দেশে অথবা বিদেশে—তাহা মা-বাবার সঙ্গেই যাওয়া হয়। পৃথিবীর সকল জায়গা হইতেই তাহাদের বাড়ীতে অতিথি আসিতেছেন। তাহাদের সমাদর করা, আপ্যায়ন করা, নানারকম কথাবার্তা বলা, দেশবিদেশের গল্প শোনা এই সব বাড়ীর ছেলেমেয়েদের কাজ। অনবরত লোকের সঙ্গে কথাবার্তায় ও মেলামেশায় যথেষ্ট জ্ঞান ও আনন্দ লাভ হইতেছে। খাবার ঘরের দেওয়ালে প্রত্যেক মহাদেশের বড় বড় ম্যাপ ঝুলিতেছে, কোন জায়গার কথা আরম্ভ হইলেই ম্যাপে তাহার অবস্থান নির্দিষ্ট হইয়া গেল। খবরের কাগজে অথবা রেডিওতে কোন জায়গার নাম শোনা মাত্রই ম্যাপে তাহা খুঁজিয়া বাহির করা হইল। কোন একটা জায়গা অথবা প্রসিদ্ধ ব্যক্তি সম্বন্ধে সমাচার সংগ্রহে হয়ত ছেলেদের অসুবিধা হইতেছে। বাড়ীর অভিভাবকদের কেহ উঠিয়া কোন জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই (Book of Knowledge) অথবা 'এন্‌সাইক্লো-

পিডিয়া' বাহির করিয়া বলিয়া দিলেন। স্কুলে যাহা কিছু শেখা হইল বাড়ী আসিয়া তাহার আলোচনা হইতেছে। মা-বাবাও তাহাতে সম্পূর্ণভাবে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন। কোথাও কোন অসুবিধা হইলে তাহা বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা হয়। বই পড়া হইতে আরম্ভ করিয়া, কেহ কোন ছবি দেখিয়াছে, কেহ কোন খেলা খেলিয়াছে, কেহ বা ভাষণ শুনিয়াছে—ইত্যাদি যাহার যাহা কিছু সঞ্চয় হয় বাড়ী আসিয়া তাহার পূর্ণ আলোচনা হয়। হাসি বা আনন্দের স্থান যে সেখানে থাকে না এমন নহে। কোন একঘেয়েমির স্থান নাই, না আছে জোর করিয়া কিছু শিখাইবার অত্যুগ্র আগ্রহ, অথচ অনায়াসেই সব কিছু শেখা হইতেছে।

মা-বাবার লক্ষ্য রাখিতে হইবে কিভাবে শিশুর মনে জানিবার বাসনা জাগানো যায়, কি করিয়া নিত্য নূতন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া জ্ঞানের ভাণ্ডার তাহার কাছে খুলিয়া দেওয়া যায়। কিন্তু আসল কথা এই যে, স্কুলের ধরাবাঁধা নিয়মের আবহাওয়া বাড়ীতে থাকিতে পারে না। সুতরাং শিশুকে কি বলা হইতেছে এবং কিভাবে বলা হইবে—সে বিষয়ে বিবেচনা করার জন্য একটি সহানুভূতিশীল মর্মস্পর্শী দৃষ্টির প্রয়োজন। শিখিবার ব্যাপারে যেন ছেলেমেয়েদের অরুচি অথবা বিতৃষ্ণা না জন্মায়।

প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থায় স্কুলের পাঠ বাড়ীতে অধ্যয়ন করা রীতিবিরুদ্ধ। কারণ প্রথমতঃ শিক্ষকেরা স্কুলে সর্বদা তাহাদের

প্রয়োজন অপ্রয়োজন তদারক করিতেছেন। যাহার যতটুকু সাহায্যের প্রয়োজন ততটুকু সাহায্য দিতেছেন; এই সব ব্যবস্থা বাড়ীতে কোথায়? তাহা ছাড়া পড়াশুনা করিবার সুযোগ বা সুব্যবস্থা সকল বাড়ীতে থাকে না। তৃতীয়তঃ ছাত্রদের বাড়ীতে পাঠের কাজ দেওয়া নূতন শিক্ষাবিদ্‌গণ বিশেষ প্রয়োজন মনে করেন না।

তাহা ছাড়া আরও দুইটি বড় কারণ আছে। পারিবারিক জীবনধারায় এবং কার্যপ্রণালীতে প্রগতিশীল শিক্ষা কোনরকম বাধার সৃষ্টি করিতে চায় না। বাড়ীতে ছেলেমেয়ে পড়াশুনায় ব্যস্ত থাকিলে একদিকে মা-বাবার পক্ষে সময়ে সময়ে ক্ষুণ্ণ হইয়া বিরক্তি প্রকাশ করা সম্ভব। আর একদিকে শিশু পারিবারিক আবহাওয়া ও সংসারের ছোটবড় নানা অভিজ্ঞতার মধ্যে আনন্দ আহরণ করিবার সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইবে। সেইজন্য এবং অন্যান্য অনুকূল অবস্থার অনুপস্থিতির দরুণও শিক্ষকেরা শিশুদের স্কুলের পাঠ বাড়ীতে অধ্যয়ন করিতে দিবার বিশেষ পক্ষপাতী নহেন। তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, গৃহে মাতাপিতার সাহচর্যেই শিশু সর্বপ্রকারে লাভবান হইবে। অতএব গৃহে পাঠচর্চায় অযথা সময় নষ্ট করিবার কোন সার্থকতা নাই।

এই সম্বন্ধে ওয়াশবার্ন পারিবারিক একটি ঘটনার কথা বলিয়াছেন। তাঁহার মেয়েকে বাড়ীর যাহা কিছু কাজ দেওয়া হইত মেয়ে তাহাতে বড় উদাসীন ছিল। বেশ বুদ্ধিমতী এবং তীক্ষ্ণধী হওয়া সত্ত্বেও সে ক্লাশে বিশেষ সাফল্য অর্জন করে

নাই। মা কিংবা বাবা কিছু বলিলে পড়ার ঘরে যাইয়া অন্যান্য নানা বিষয়ে ও চিত্তাকর্ষক বইয়ে মন দিত কিংবা রেডিও খুলিয়া বসিত। একদিন জনৈক বন্ধু কথাপ্রসঙ্গে ছেলেমেয়ের কথা আরম্ভ করিতেই ওয়াশবার্ন দম্পতি মনের দুঃখ প্রকাশ করিলেন। বন্ধুবর আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন যে তাঁহার মেয়েদেরও এই অবস্থা গিয়াছে; সুতরাং অনর্থক ভাবিবার কোন কারণ নাই। বরঞ্চ মেয়ের অভিরুচি অনুসারে শরীর ও মনের খোরাক নিজেকেই সংগ্রহ করিতে দেওয়া হউক। মা-বাবা বাড়ী ফিরিয়া মেয়েকে নানাভাবে ইহাই বুঝাইলেন—তবে সময় ও প্রয়োজনমত তাঁহারা মেয়ের পাশেই আছেন, এ কথা বলিতেও ভুলিলেন না। বাস্তবিকই আশ্চর্যের কথা যে, মেয়ে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল এবং দিনের পর দিন উন্নতি করিতে লাগিল।

ছেলেমেয়েদের উপর অনেকখানি নির্ভরতা এবং দায়িত্বের ভার দিতে হয়; নিজেদের কর্তব্য সম্বন্ধে ছেলেমেয়েরা সচেতন হইলেই মা-বাবার অসন্তোষের কোন কারণ থাকিবে না। অভিভাবকেরা যেখানে অত্যধিক চিন্তা করেন, ছেলেমেয়েরা সেখানে নিজেদের দায়িত্বে কাজ করিতে শিখে না—তাহারা ভিন্ন অবস্থায় মানাইয়া চলিতে পারে না। অভিভাবকেরা কঠোর হইলে ছেলেরা হয় উচ্ছৃঙ্খল। অতএব অভিভাবকদের কাজ কি? তাঁহাদের কাজ হইল অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করা, সুযোগ দেওয়া, সুবিধা

দেওয়া। মোট কথা এমন জমি তৈরি করিতে হইবে—যেখানে রৌদ্র, জল ও সার আদি—ভাল ফসল উৎপাদনের সকল সরঞ্জাম থাকিবে। তারপরে বাকীটুকু ছেলেদের হাতে ছাড়িয়া দাও। যতটুকু তাহাদের প্রয়োজন—তাহারা ঐ অবস্থাতে সেইমত সুবিধা করিয়া লইবে; এবং এই ভাবে উন্নতি করিবে। চাপ দিয়া কোন ভাল কাজ শিখানো যায় না। সমৃদ্ধির যে বীজ মানবসন্তান বহন করিয়া আনিয়াছে, তাহা আপনিই ফলফুলশোভিত বৃক্ষে পরিণত হইবে।

সমাজশাস্ত্র শিক্ষার ব্যাপারে আরও কয়েকটি কথা বলিবার আছে। ছেলেরা ক্রমশঃ যত উচ্চ হইতে উচ্চতর শ্রেণীতে উঠিতে থাকে ততই তাহারা যুগোপযোগী নানা মতবাদের সম্মুখীন হইতে থাকে। অবশ্য স্কুল যদি প্রগতিশীল হয় তবেই নিজের দেশের তথা পৃথিবীর তৎকালীন নানা বিষয়ে চিন্তা করা ছাত্রদের পক্ষে স্বাভাবিক হয়। কতকগুলি বিষয়ে, যেমন শাসন ও শ্রমিক ব্যবস্থা, সরকারী মালিকানা (Government ownership), নিয়ন্ত্রণ বনাম অবাধ উদ্যোগ (Control vs. free enterprise), প্রতিযোগিতা বনাম সহযোগিতা (Competition vs. co-operation), যুদ্ধ ও শান্তি, সংযুক্ত রাষ্ট্রসঙ্ঘ (United Nations), রাশিয়া ও সাম্যনীতি—প্রত্যেক জিনিসেরই ভালমন্দ বিচার ছেলেরা এই সময়ে করে। এই বিষয়গুলি লইয়া চিন্তা করিতে থাকিলে স্বভাবতঃই কোন সময়ে কিছু-না-কিছু কথা বলিতেও থাকিবে। হয়ত তাহাদের

বক্তব্যের অনেক অংশই তাহাদের নিজস্ব মতামত এবং শিক্ষক অথবা মাতাপিতা যাহা বলিয়াছেন তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। এক্ষেত্রে তাহাদের চিন্তাধারা খুব মনোযোগের সঙ্গে শুনিতে হইবে; দেখিতে হইবে কি রকম দক্ষতার সহিত সমস্যার সমাধানে তাহারা মতামত প্রকাশ করিতেছে। হয়ত কতগুলি কাঁচা মন্তব্য করিয়া বসিবে। আমাদের ঐ বয়সে ঐ রকমই হইত—এখনও যে না হয় তা নয়। কিন্তু যাহাতে তাহাদের নিজেদের চিন্তা করিবার ও কোন বিষয় সম্বন্ধে উৎসাহের সঙ্গে যুক্তিসঙ্গত ভাবে আলোচনা করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় আমরা ইহাই চাই। তাহারা কতবার নিজেদের মত বদলাইবে, তাহাদের ক্ষণিকের যুক্তি অথবা সিদ্ধান্তকে গ্রাহ্য মনে করিবার প্রয়োজন নাই।

প্রায়ই আমরা যাহা বলি তাহা করি না। আমার ছেলে এখন কৈশোরের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া যৌবনের দ্বারে পা বাড়াইয়াছে। এখন কলেজে পড়ে; সে এমন সমস্ত মতামতে বিশ্বাসী হইয়া পড়িল যাহা আমি সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করি। তাহার সহিত তর্ক চালাইলাম, প্রবল তর্কবিতর্ক, কিছুক্ষণ পরে আমার মনে হইল যে প্রৌঢ়ত্বের অভিজ্ঞতার উপরে দাঁড়াইয়া আমি যে যুক্তি দিতেছি—তাহার প্রতি আমার ছেলের বিন্দুমাত্র সম্মান বা শ্রদ্ধা নাই। এখন মনে হয় আমার মতের প্রতি শ্রদ্ধা না থাকিবার একমাত্র কারণ এই যে তাহার মতামতের প্রতিও আমি শ্রদ্ধা দেখাই নাই। আমার দেখা উচিত ছিল যে,

বয়সের সঙ্গে তাহারও পরিপক্কতা আসিয়াছে। তাহার আগ্রহ-অনুরাগকে, তাহার চিন্তাধারাকে আমার শ্রদ্ধা জানানো উচিত। আর এ কথাও সত্য যে বয়োবৃদ্ধ হইলেই যে কেহ জ্ঞানী হইবে তেমন কোন কারণ তো নাই। যে সকল বিষয়ে আমাদের প্রাচীনদের মতামত জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে, সেই সব বিষয়ে তরুণ মনের বিচার একান্ত অহিতকর হইবেই এমন কোন কথা নাই। বয়সের প্রতি অত্যধিক সম্মান প্রদর্শনের যে রীতি প্রচলিত ছিল তাহার ফলে চীনদেশে বহু শতাব্দীকাল সামাজিক উন্নতি প্রতিরুদ্ধ হইয়া ছিল। তরুণের মধ্যে অনেক নূতন চিন্তাধারা আছে, যাহার কল্যাণে সামাজিক উন্নতি সাধিত হওয়া সম্ভব।

প্রগতিশীল স্কুলে মাতাপিতার নানাবিধ সংস্কারাদি লইয়া খোলাখুলিভাবে বিশ্লেষণ তথা আলোচনা করা হয়। বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন ধর্ম, বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রথা ইত্যাদি সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে যে কত রকমের সংস্কার রহিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। আমাদের সেই সব সংস্কারকে পুনরায় পরীক্ষা করিয়া অনেকগুলিকে উৎপাটিত করিতে হইবে; আমাদেরই ছেলেমেয়েদের মধ্যে হয়ত আরো নিরপেক্ষভাবে সে সমস্ত বিচার করিয়া যাচাই করিবার ক্ষমতা রহিয়াছে। এ কথা জানিয়া আমাদের প্রফুল্ল হইবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। এইরূপ কথা বলা সহজ কিন্তু কাজে পরিণত করিতে ইহাপেক্ষা কঠিন আর কিছু নাই। ছেলেদের পরিষ্কার

মনের খোলাখুলি মতামত শুনিয়া ক্ষুব্ধ হইবার পরিবর্তে আমাদের উচিত তাহাদেরই যুক্তিতে তাহাদের মতামত বিচার করা।

'লেখা', 'পড়া', 'অঙ্ক', 'বিজ্ঞান' ইত্যাদি শিখিবার যে পদ্ধতির কথা এতক্ষণ বলা হইয়াছে সেই পদ্ধতিতে সঙ্গীত, কলা, সাহিত্য, নৃত্য, নাটক, অঙ্কন ইত্যাদিও শিখিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। মাতাপিতা হিসাবে আমাদের দায়িত্ব হইতেছে এই যে, আমাদের ছেলেমেয়েদের ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে, তাহাদের অধিক হইতে অধিকতর সুযোগ ও সুবিধা যোগাইতে হইবে, প্রত্যক্ষভাবে তাহাদের কীর্তিতে, তাহাদের সৃজনকর্মে, তাহাদের উৎসাহে আগ্রহশীল হইতে হইবে।

পিতামাতার সঙ্গে স্কুল এবং শিক্ষকের কিরকম সম্বন্ধ থাকা প্রয়োজন ?

ছেলেমেয়েরা উচ্চশিক্ষার (High School) ধাপে পৌঁছিবার আগে পর্যন্ত অভিভাবকদের স্কুলের শিক্ষকদের সঙ্গে যথেষ্ট পরিচয় রাখিতে হইবে। ইহার পরেও পরিচয় রাখা কর্তব্য বটে কিন্তু তখন পরিচয় রাখা একটু কঠিন হইয়া পড়ে। কারণ উচ্চস্তরে শিক্ষকের সংখ্যা বেশি, এবং সেই বহুসংখ্যক শিক্ষক বিভিন্ন প্রকৃতির অসংখ্য ছাত্রের সংস্পর্শে আসিয়া থাকেন। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এইরকম দেখা যায় না। কৈশোরের শেষে ছেলেমেয়েদের পিতামাতার উপর নির্ভরশীলতার সম্পর্ক ক্রমশঃ শিথিল হইয়া আসে, সেইজন্য

অভিভাবকদেরও শিক্ষকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রাখার আর তত প্রয়োজন থাকে না।

নার্সারি, কিণ্ডারগার্টেন এবং প্রাথমিক শিক্ষার সমস্ত স্তরে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা যেন একটি সমবায় উদ্যোগ (co-operative enterprise) ; যেখানে শিক্ষক এবং অভিভাবক সমানভাবে অংশীদার। অভিভাবক এবং মাতাপিতা হিসাবে আমরা ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে শিক্ষকের যাহা কিছু জানা প্রয়োজন, বলিতে পারি ; কেননা শিক্ষক নিজ জ্ঞানবুদ্ধির দ্বারা তাহাদের চালিত করিতেছেন ; স্কুলের নীতিনিয়ম এবং জীবনধারা তাহাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত প্রয়োজন অনুসারে তাহাদের কাছে তুলিয়া ধরিতেছেন ; এবং ছেলেদেরই নিজেদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে স্বাধীনভাবে নিজের পায়ে দাঁড়াইতে সাহায্য করিতেছেন। অপরপক্ষে শিক্ষকও আমাদের যে সমস্ত জিনিস জানা প্রয়োজন তাহা বলিয়া আমাদের সাহায্য করিবেন। আমাদেরই ছেলেমেয়ে, স্কুলে নানাশ্রেণীর ধাপে ধাপে উঠিবার কালে বিভিন্ন অবস্থাতে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর সামনে তাহারা চালিত হইতেছে ; তাহাদের যে সমস্ত বিশেষত্ব আমরা বাড়ীঘরে দেখিতে পাই না সেগুলি শিক্ষকের কাছে জানিতে হইবে।

সহযোগিতার এই সম্পর্ক স্থাপন করিতে কয়েকটি জিনিসের আবশ্যক। প্রথমতঃ শিক্ষক ও অভিভাবকের মধ্যে বন্ধুত্বের ও বিশ্বাসের এবং পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধার সম্পর্ক থাকিবে। উভয় পক্ষেরই জানা প্রয়োজন যে মানুষ হিসাবে উভয় পক্ষেরই

ভুল-ত্রুটি হইবে, তাহা সত্ত্বেও তাঁহারা অন্তরের সহিত ছেলে-মেয়েদের কল্যাণ কামনায় উৎসাহী এবং তাহাদের উন্নতিতে আগ্রহশীল। পরস্পর সহযোগিতা থাকিলে ভুল-ত্রুটির সম্ভাবনা কম হইবে এবং অধিকতর মঙ্গলের আশা থাকিবে।

দ্বিতীয়তঃ, আমাদের বুঝিতে হইবে যে শিক্ষক আমাদের ছেলের জন্য কি করিতে যত্নবান, তাঁহার শিক্ষার কি উদ্দেশ্য এবং সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির সঙ্কল্পে তিনি কি পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন। এই সব জানিলে ছেলেদের উপর পরিবারের প্রভাব অনেকটা সুসঙ্গত ও ফলপ্রদ হইবে।

তৃতীয়তঃ, ছেলেমেয়েরা বাড়ীতে আসিয়া শিক্ষকের সমালোচনা আরম্ভ করিয়াছে দেখিলে শিক্ষকের পক্ষে অথবা বিপক্ষে মতামত প্রকাশ করা আমাদের উচিত নহে। আমাদের ভাব (attitude) এমন রাখা উচিত যাহাতে ছেলেমেয়েরা বোঝে যে আমরা তাহাদের মন্তব্য সহানুভূতির সহিত শুনিতেছি। তাহা ছাড়া শিক্ষকের দৃষ্টির দিক হইতে সমস্ত ব্যাপার কেমন দাঁড়ায় তাহাও বুঝাইতে হইবে ; প্রকৃত ভুল যেখানে রহিয়াছে তাহাও আমাদের বুঝিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। তবুও যদি সত্যই তাহাদের প্রতি অবিচার হইয়া থাকে তবে ছেলেমেয়েরা যেন মাতাপিতার মধ্যে বন্ধুভাব অনুভব করিতে পারে ; সমস্ত বাধাবিপত্তির মধ্যে তাঁহাদের সাহায্য এবং আশ্রয় পাইবে এই বিশ্বাস যেন তাহাদের মনে থাকে।

যদি সমস্যা ঘোর বা জটিল মনে হয় তবে শিক্ষকের কাছেই

আমাদের যাওয়া উচিত। কোন পক্ষকে আড়াল দিবার ইচ্ছায় নহে; কেবল শিক্ষকের মতামত এবং সেই বিশেষ ব্যাপার সম্পর্কে একটি সহজ সমাধান খুঁজিবার অভিপ্রায়ে। যদি অভিযোগ আমাদের দিক হইতে হয়, ইহা স্বাভাবিক যে শিক্ষক সেই অভিযোগের ঔচিত্য সম্বন্ধে মন্তব্য করিবেন। যদি আমাদের মধ্যে সহানুভূতিশীল এবং উদার মনের পরিচয় পান, তিনি নিজে স্বয়ং অনুরূপ ব্যবহার করিবেন। সুতরাং হঠাৎ মনের আবেগে শিক্ষকের সম্পর্কে ভুল ধারণা কিংবা শিক্ষক অবিচার করিতেছেন এই ধারণার বশবর্তী হইয়া আমাদের যাওয়া চলিবে না। যতক্ষণ মন শান্ত না হয় এবং যতক্ষণ নিরপেক্ষ ভাবে সমস্ত কিছু দেখিতে না পারিব ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। যদি শিক্ষকের সহিত পূর্বেই আমাদের সহৃদয়তার সম্পর্ক থাকে তবে মনের কালিমা এবং ক্ষোভ মিটাইতে বেগ পাইতে হইবে না।

স্কুলের সঙ্গে আমাদের যে সম্বন্ধ থাকিবে তাহা কেবলমাত্র সহযোগিতারই নহে, অপর কিছুরও। স্কুল একটি সমাজ অথবা গোষ্ঠী হিসাবে শিক্ষক ও ছেলেদের উপর প্রভাব বিস্তার করে। স্কুলপরিদর্শন করা যেমন আমাদের কর্তব্য, তাহাকে বুঝিবার চেষ্টা করাও তেমনই প্রয়োজন। শিক্ষক অভিভাবক সঙ্ঘে (Parent Teachers' Association) আমাদের সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যান্য সমস্ত অভিভাবকের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া আমাদের দেখা কর্তব্য যে স্কুলে শিক্ষার

অনুকূল সমস্ত ব্যবস্থাই রহিয়াছে কিনা, শিক্ষকের কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে অসুবিধা অথবা বাধা হইতেছে কিনা, স্কুলবাড়ী কতখানি সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন এবং আকর্ষণীয় এবং সেখানে স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া কতখানি বিরাজমান। আমাদের দেখা কর্তব্য যেন ক্লাশের ছাত্রসংখ্যা এমন অসম্ভব ভাবে বৃহৎ না হয় যাহাতে শিক্ষক প্রতিটি ছাত্রকে চিনিতে, জানিতে এবং তাহার উন্নতি সাধনে সাহায্য করিতে অসমর্থ হন। ক্লাশে ত্রিশজনের বেশি ছাত্র থাকিলেই শিক্ষকের পক্ষে ছাত্রের জন্য সাধ্যমত সব কিছু করা অসম্ভব হইয়া পড়ে।

নাগরিক হিসাবে ভাল স্কুলের পৃষ্ঠপোষকতা করা আমাদের কর্তব্য। নাগরিক হিসাবে আমাদের অভিভাবকদের যে কঠিন দায়িত্ব রহিয়াছে তাহা হইতেছে শিক্ষাবোর্ডের সভ্য নির্বাচন। আমরা সময়ে সময়ে বড় শিথিলতা প্রকাশ করি। এইরকম বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যাপারে আমাদের অবহেলা নিন্দনীয়। কিন্তু এ কথা সত্য যে, অন্যান্য অভিভাবকদের সঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া যদি বিচক্ষণতার সঙ্গে কাজ করা যায় তবে অবস্থাকে আয়ত্তে আনা সম্ভব। যেখানে স্কুলবোর্ডের সদস্যদের নির্বাচিত হওয়ার প্রথা রহিয়াছে, আমরা সেখানে আমাদের মধ্যেই দূরদর্শী ধীসম্পন্ন ব্যক্তিকে নির্বাচিত করিয়া সঙ্ঘ গঠন করিতে পারি।

যে বোর্ডের নিয়োজিত (appointed) হইবার ব্যবস্থা রহিয়াছে, আমাদের মনোনীত যোগ্য ব্যক্তিদের নিযুক্ত করিবার জন্য মেয়র কিংবা নির্বাচন সমিতির কর্তার উপর যথেষ্ট প্রভাব

বিস্তার করিবার প্রয়াস করিব। ক্ষমতা আমাদের আছে তবে কার্যে ঠিকমত ব্যবহার আমরা খুব কমই করিয়া থাকি। ছেলে-মেয়েদের সুশিক্ষার বন্দোবস্ত করা অপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় বিষয় আর কি থাকিতে পারে? যদি আমাদের শৈথিল্য এবং অবহেলা এমন গভীর ও ভয়ঙ্কর হইয়া ওঠে, তবে কি করিয়া এই কাজ সুসম্পন্ন হইবে?

নাগরিক হিসাবে স্কুলের আর্থিক দায়িত্বের দিকটাও আমাদের দেখা কর্তব্য। এইদিকে সেইদিকে কত অর্থই আমরা অপব্যয় করিয়া থাকি। সেই ক্ষেত্রে ছেলেমেয়েদের সুশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে টাকা নাই বলিলে চলিবে কেন?

প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে অভিভাবকদের একটি দল তাঁহাদেরই একজনের গৃহে উইনেট্‌কাতে সমবেত হইলেন। পূর্বাঞ্চলের কলেজে তাঁহারা শিক্ষিত হইয়াছিলেন আর ছাত্র ছিলেন প্রাইভেট স্কুলের। ঐ স্থানে একটি প্রাইভেট স্কুলের পত্তন করিবার উদ্দেশ্যেই এই দল সমবেত হইয়াছিল। একজন বলিলেন, "আমাদের ছেলেদের পাঠিয়ে গর্ব বোধ করতে পারি তেমন পাবলিক স্কুল কি আমরা গড়ে তুলতে পারি না?" প্রথমে তাঁহার কথা কেহ গ্রাহ্য করিলেন না। কারণ সমিতির বৈঠক সেই উদ্দেশ্যে ডাকা হয় নাই। কিন্তু পরিশেষে তিনি এত সমর্থন পাইলেন যে উহার আলোচনার জন্য দ্বিতীয় একটি বৈঠক আহ্বান করা হইল। এই বৈঠকে ছেলেমেয়েদের মাতা এবং পিতা উভয়কেই নিমন্ত্রণ করা হইল। বৈঠকে সকলেই

একমত হইয়া বলিলেন যে, যিনি নূতন স্কুলের সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছেন তিনি যদি স্বয়ং ঐরূপ একটি স্কুল পরিচালনা করেন তাহা হইলে অন্যান্য সকলেই তাঁহাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত। ভদ্রলোক সম্মত হইলেন; কিন্তু শর্ত রহিল যে উপস্থিত অভিভাবকদের মধ্যেই কয়েকজন স্কুলের পরিচালক বোর্ডের সদস্য হইবেন।

তিন বৎসরের মধ্যে স্কুল বোর্ডের ভার কতিপয় দূরদর্শী, দক্ষ নাগরিকের হাতে আসিয়া গেল; উইনেট্‌কার স্কুলগুলিকে আদর্শ স্কুলে পরিণত করা তাঁহাদের ব্রত হইল। উইনেট্‌কার সেই নূতন পাবলিক স্কুলগুলি সেই শতাব্দীর প্রথম প্রগতিশীল স্কুল বলিয়া প্রচারিত হইল এবং স্কুলগুলি বিশেষ সুনাম অর্জন করিল। সেই বৎসরেই যুক্তরাষ্ট্রের বত্রিশজন রোড্‌স্ (Rhodes) স্কলারের মধ্যে দুইজনই ছিল ছোট উইনেট্‌কা শহরের পাবলিক স্কুলের গ্র্যাজুয়েট। একমাত্র এইরূপ সংগঠনের দ্বারাই, আমরা অভিভাবকেরা, ছেলেমেয়েদের জন্য ভাল স্কুলের প্রতিষ্ঠা করিতে পারি। আমাদের দায়িত্বই এইখানে—সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া এবং সমবেত ভাবে এইরূপ সংগঠনের সঙ্গে কাজ করা।

প্রগতিশীল শিক্ষা আমাদের আদর্শ হইলে তাহার জন্য কাজ করিতে হইবে। ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থায় এই প্রগতিশীল বিদ্যালয় যেমন সাহায্য করিতে পারিবে তেমন আর কিছুতেই হইবার নহে।

দশম অধ্যায়

প্রাচীন শিক্ষার সহিত এই শিক্ষার পার্থক্য

উপসংহারে প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থার সহিত প্রগতিশীল শিক্ষা-ব্যবস্থার তুলনা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। শিক্ষকদের অথবা স্কুলগুলিকে কিন্তু একইরূপ বাঁধাধরা দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, এমন নহে। কম শিক্ষকই এতটা প্রগতিশীল আছেন, যিনি পুরাতন চিন্তাধারাকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিতে পারিয়াছেন কিংবা যে শিক্ষায় এককালে তাঁহারা মানুষ হইয়াছেন তাহার কিছুটা প্রভাবও নূতন শিক্ষায় না দেখাইয়াছেন। আবার এমন শিক্ষকও কমই আছেন, যাঁহারা প্রাচীনমতে শিক্ষিত অভিভাবক-দের দ্বারা প্রভাবিত হন নাই। আবার প্রাচীন পন্থা অনুকরণ করিতেছেন এমন খুব কম শিক্ষক আছেন, যাঁহারা প্রগতিশীল শিক্ষার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং উদার মতামতকে কিছুটা গ্রহণ না করিয়াছেন। কয়েকজন আছেন, যাঁহাদের দুই মতবাদের শেষ প্রান্তে স্থাপন করিয়া পার্থক্য নির্দেশ করা যায়। কিন্তু অধিকাংশই মানদণ্ডের দুই প্রান্তের মাঝামাঝি অবস্থান করিতেছেন।

দেখা যায়, শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং শিক্ষাপ্রণালী এই দুইটি বিষয়ে দুই শিক্ষাব্যবস্থায় বিশেষ প্রভেদ রহিয়াছে।

শরীরের গঠন এবং স্বাস্থ্য

প্রাচীন গ্রীক ও রোমের শিক্ষাব্যবস্থায় 'সুস্থ শরীর ও সুস্থ মন' রাখিবার প্রচেষ্টা ছিল। সে যুগের উহাই ছিল উদ্দেশ্য। পরে মধ্যযুগে ধারণা হইল যে শরীর হইতেই পাপের জন্ম, সুতরাং শরীরের গঠন অবহেলা করা হইত। তখন শিক্ষার বয়স ছিল সম্পূর্ণরূপে বৌদ্ধিক, এবং ধর্মনীতিকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষাকার্য চলিত। মধ্যযুগের এই দৃষ্টিভঙ্গী বিংশ শতাব্দীর আরম্ভ পর্যন্ত অত্যন্ত প্রবল ছিল। সুতরাং স্বাস্থ্য এবং শারীরিক শিক্ষাকে (Physical Education) পুনরায় স্কুলের শিক্ষাক্রমে স্থান দিতে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল। এখনও যেখানে প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত সেখানে শারীরিক শিক্ষার স্থান একরকম নাই বলিলেই চলে। হয়ত বা নামেমাত্র এক 'পিরিয়ড' কোনরকমে ব্যায়াম ইত্যাদির জন্য রাখা আছে, এবং এক 'পিরিয়ডে' হয়ত 'স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও শরীরতত্ত্ব' পড়াইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রাচীনপন্থী মাতাপিতার মনে এখনও এই ধারণাই রহিয়াছে যে, স্কুলের শিক্ষাব্যবস্থায় 'শারীরিক শিক্ষা' চলিত করা এমন কিছু প্রয়োজনীয় নহে। দেশে আর্থিক মন্দার সময়ে (depression) এই মনোভাব সুস্পষ্ট হইল। কারণ বহু স্কুলে, অর্থের টানাটানিতে যখন আয়ব্যয়ের নূতন করিয়া হিসাব করা হইল তখন ভাষা অথবা ব্যাকরণ অথবা জ্যামিতির

শিক্ষককে ছাড়াইয়া দিবার কথা কর্তাদের মনে হইল না; শারীরিক শিক্ষার ব্যবস্থা বন্ধ করার কথাই প্রথম উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐ বিভাগের শিক্ষকের এবং নার্সের ছাঁটাই হইল।

শরীর, মন এবং অনুভূতি যে একই শিশুর অংশ, এবং ঐগুলির পরস্পরের মধ্যে যথেষ্ট যোগাযোগ রহিয়াছে, প্রগতিশীল শিক্ষায় তাহাই স্বীকার করা হইয়াছে। সুতরাং বিদ্যার্থীর স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা অতি প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করা হয়। কেবল যে পৃথক্ কোন একটি বিষয় হিসাবে শরীরতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া হইবে অথবা ব্যায়ামের পিরিয়ডে শরীর চর্চা করিলেই হইবে, তাহা নহে। স্কুলের সর্বাঙ্গীণ কার্যপ্রণালীর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে এই শিক্ষা জড়িত থাকিবে। অঙ্কের মাধ্যমে ছেলেদের উচ্চতা ও ওজনের বৃদ্ধি বা হ্রাসের গতি, অসুস্থতার কারণবশতঃ উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির হার অথবা দুর্ঘটনার সংখ্যা ইত্যাদি শেখান হইবে। বিজ্ঞান শিখাইবে শরীরতত্ত্ব এবং রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থা। সমাজবিজ্ঞানে থাকিবে নগর এবং রাষ্ট্রের সর্বসাধারণের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক কথা। কলাবিজ্ঞানে থাকিবে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সম্বন্ধে নানা ছবি ও বিজ্ঞাপন। ক্লাসে শিক্ষকের কাজ হইবে স্বাস্থ্যকর অভ্যাস অনুশীলন করাইবার প্রচেষ্টা। তাহা ছাড়া, বাহিরের দৌড়ধাপের খেলা তো রহিয়াছেই, সুদক্ষ ব্যায়ামবীরের নির্দেশে ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়া হইবে। নানারকম ঘরে বসিয়া খেলারও

প্রচলন থাকিবে। খেলা ও লোকনৃত্যের যথেষ্ট সমাদর আজকাল হইতেছে।

ভাবাবেগের সামঞ্জস্য

স্কুলের ব্যবস্থায় একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ের আবশ্যকতা সম্বন্ধে প্রাচীন পদ্ধতিতে অভিভাবকেরা মোটেই সচেতন ছিলেন না। সাহসের সঙ্গে অবিচলিতভাবে সমস্ত অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার যে ক্ষমতা, এক কথায় ছাত্রদের মনে যাহাতে ভাবের স্থৈর্য অনুভূত হয়, সে বিষয়ে শিক্ষাদান যে কত প্রয়োজনীয় তাহা বোধ হয় তাঁহারা ভাবিয়া দেখিতেন না।

পুরাতন ব্যবস্থায় এই অত্যাবশ্যক বিষয়কে অবহেলা করা হইয়াছে। বরঞ্চ বিপরীত পরিবেশে অনুভূতির সেই দিক্‌টার যেন সুন্দররূপে পরিচর্যা না হয় তাহারই চেষ্টা চলে। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, জীবনে কতকগুলি অবশ্যপ্রয়োজনীয় বস্তু রহিয়াছে—যেমন আত্মপ্রকাশের সুযোগ, নিরাপত্তার আশ্বাস, স্নেহ ও ভালবাসা পাওয়া, সমাদৃত হওয়া, সফল হওয়া, অপরের সঙ্গে একত্র কাজ করিবার সুযোগ, নিজেকে দলভুক্ত বলিয়া গণ্য করিয়া আনন্দ লাভ করা, এগুলি মানুষের সত্যকারের আকাঙ্ক্ষার বস্তু। তথাপি প্রাচীনপন্থী স্কুলে কাজের ভারে এবং অনুশাসনের দাপটে আত্মপ্রকাশের ক্ষমতাকে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলা হয়। ছেলেদের দক্ষতায় অভিজ্ঞতায় পরিপক্বতায় পরস্পরের মধ্যে যে প্রভেদ রহিয়াছে তাহা অবহেলা করিয়া

সকলকে একই ধরণের কাজ দেওয়া হয়। অপেক্ষাকৃত কম নম্বরের দরুণ অসাফল্যের জন্য শাস্তিবিধান করা হয়; ইহাতে ছেলেদের নিরাপত্তার অবস্থা যেমন চলিয়া যায়, তেমনই উৎসাহের পরিবর্তে মনে বিরক্তি জাগে। শিক্ষক ও ছাত্রদের পরস্পর আদানপ্রদানের সুবিধা বিনষ্ট হয়। পরস্পর আদান-প্রদানের মধ্য দিয়া সমাজবদ্ধ মিলিত জীবনযাপনের অভ্যাসের পথ বন্ধ করা হয়। ফলে কোন সাধারণ লক্ষ্যকে সামনে রাখিয়া সকলের সহযোগিতায় যে কাজ হইবে তাহাও হইতে পারে না।

অপরপক্ষে, প্রগতিশীল শিক্ষায় মানুষের এই সমস্ত প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হইবার সুযোগ রহিয়াছে। এখানে সকলেই জানে যে, যে ব্যক্তি সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই তিনি কতখানি অসুখী। বিবাহিত জীবনে, সন্তানের অভিভাবক হিসাবে তাঁহাকে কি পরিমাণ ব্যর্থতা ও নৈরাশ্য ভোগ করিতে হয়, নাগরিক জীবন তাঁহার কেমন অবলম্বনহীন হইয়া পড়ে। যাঁহার নিজের মনেই শান্তি নাই, যিনি অসুখী এবং বিক্ষুব্ধ, তিনি আনন্দপূর্ণ জীবন অতিবাহিত করিবার আশা করেন না। সামাজিক উন্নতির জন্য কিছু বিশেষ কাজ তিনি করিয়া উঠিতে পারিবেন এইরূপ ভরসা করা যায় না। যিনি প্রকৃতই সমাজে বেমানান হইয়াছেন তাঁহার মধ্যে চরিত্রের ও স্বভাবের কোন কোন দোষত্রুটি দৃষ্টিগোচর হইবে, ইহাতে আশ্চর্যের কি! এই প্রকারের

দোষত্রুটিজনিত অপরাধে দণ্ডিত ছেলেদের কারাগারে দেখা যায়। যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বিশ কিংবা পঁচিশ জনের মধ্যে একজন পাগলাগারদে অথবা মানসিক রোগীদের স্বাস্থ্যাবাসে জীবন কাটাইয়া দেয়।

সুতরাং সুন্দর মানসিক স্বাস্থ্য গঠন করিতে, হৃদয়ে প্রশান্তির ভাব ও প্রসন্নতা জাগ্রত করিতে প্রগতিশীল শিক্ষাই একমাত্র উৎকৃষ্ট উপায়। শিক্ষার্থীরা চিত্তে আত্মবিশ্বাস ও আনন্দ রাখিবে, এবং খেলায় কিংবা কাজে লোকের সহিত স্ফূর্তির সঙ্গে মেলামেশা করিবে, প্রগতিশীল শিক্ষার ইহাই উদ্দেশ্য। স্কুলের আবহাওয়া, শিক্ষকের মনের ভাব এবং অন্তর্দৃষ্টি, পড়াইবার পদ্ধতি, ছেলেদের ক্রিয়াকর্মের নিত্য নূতন পরিবেশ যোগান—এ সমস্তই নূতন শিক্ষার সৃষ্টি। বোধ হয়, প্রগতিশীল শিক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ সার্থকতা এইখানে।

শিল্পকলা

স্বাস্থ্যবিদ্যার মত সঙ্গীত ও শিল্পকলা চর্চার ক্ষেত্রেও প্রাচীন স্কুলে অধিকতর বিপত্তি অতিক্রম করিতে হইত। কোন রকমে একটু স্থান যদিও বা মিলিল, কিন্তু পাঠ্যক্রমের প্রধান বিষয় বলিয়া ঐগুলিকে মর্যাদা দেওয়া হইল না। জাতির আর্থিক মন্দার সময় যুক্তরাষ্ট্রের অধিকসংখ্যক স্কুলে সঙ্গীত ও কলা-শিক্ষকের ছাঁটাই হইল; পাঠ্যক্রম হইতে ঐ বিষয়গুলিকে তুলিয়াই দেওয়া হইল। প্রগতিশীল শিক্ষার প্রতিষ্ঠার পরেও

আজ পর্যন্ত এই দুইটি বিষয় তেমন সমাদর পায় নাই। পুরাতন প্রথার স্কুলগুলিতে সঙ্গীত ও কলার যে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহাতে না আছে প্রাণ, না আছে আনন্দ, না আছে কলার সৌন্দর্য, না আত্মপ্রকাশের মহিমা। কেবলমাত্র পাঠ্য বিষয়ে যোগ ছাড়া ইহাতে আর কোন উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে না।

প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থায় ছেলেদের নৃত্যগীত, নানা বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি শিখাইবার সুবিধা রহিয়াছে। চারিদিকে ছেলেদের নিজেদের হাতে আঁকা সমস্ত ছবি, দেওয়ালের গায়ে চিত্রাঙ্কন, নাটকের অভিনয় উপলক্ষ্যে রঙ্গমঞ্চের শ্রী ও সৌষ্ঠব সৃষ্টি সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীদের কত গভীর উৎসাহ দেওয়া হইতেছে। কাদামাটি, ইটপাথরের কত জিনিস কত আসবাব তৈরী হইতেছে। নৃত্যেরই বা কত প্রকার, কত ধরণ! ছেলেরাই নিজেদের নাটক তৈরী করিতেছে, লিখিতেছে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে নাট্যাভিনয় করিতেছে; তাহার জন্য মুখস্থ করিয়া কিছু আয়ত্ত করিবার প্রয়োজন নাই। লেখার মধ্যে চমৎকার মৌলিকতা, কত গল্প, কবিতা—কখনও বা ছাপান হইতেছে, কখনও বা হাতের লেখায় কাজ চলিতেছে।

কর্মকুশলতা

ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞানের তথ্য এবং লেখাপড়া ও অঙ্ক কষিবার কৌশল, এই সবই পুরাতন শিক্ষার কেন্দ্রস্বরূপ।

শিক্ষকের কত সময় এবং স্কুলের নিয়মপঞ্জীর কতখানি সময়ই না ইহার জন্য নিযুক্ত থাকে! কিন্তু তাহাতে ফল বিশেষ আশাপ্রদ হয় কি? যুক্তরাষ্ট্রের গত ১০০ বৎসরের ইতিহাস আলোচনা করিয়া এ ব্যাপারে বিশেষ অবনতি দেখা গিয়াছে। কলেজের অধ্যাপকগণ ক্রমাগত হাই স্কুলের শিক্ষাব্যবস্থার উপর দোষারোপ করিয়াছেন। যে অল্পসংখ্যক ছাত্র হাই স্কুল পর্যন্ত আসিয়াছে, তাহারাও তীব্রভাবে প্রাথমিক শিক্ষার অসংখ্য ত্রুটি বাহির করিয়াছে। হাই স্কুলের উচ্চশ্রেণীর শিক্ষকদের মন্তব্য এই ছিল যে, নিম্নশ্রেণীতে ছেলেদের শিক্ষার ভিত্তি অত্যন্ত খারাপ এবং ফাঁকা।

প্রগতিশীল শিক্ষায় জ্ঞান অর্জন এবং কর্মের নিপুণতা, উভয়েই বিশেষ যত্নের সঙ্গে শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু এই জ্ঞান ও কর্মপটুতা শিখাইবার সময় যথেষ্ট দৃষ্টি রাখা হয় যেন জীবনযাত্রার কাজে সেগুলি প্রয়োগের সুযোগ আসে এবং সেগুলি আয়ত্ত করিবার সময়ে দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতার সাহায্যে যেন তাহারা আয়ত্ত করিতে শেখে। সকল বিষয় বুঝিয়া শিখিবার উপর যথেষ্ট জোর দেওয়া হয়; অনর্থক বাজে অভ্যাস করাকে আমলই দেওয়া হয় না। প্রকৃত জীবনধারার সঙ্গে শিক্ষণীয় বিষয়ের যখন সম্পর্ক খুঁজিয়া পাওয়া যায়, তখনই কেবল সে বিষয়ে সার্থকতা বোঝা যায়।

প্রগতিশীল শিক্ষার সব চেয়ে বড় অবদান, শিক্ষায় বিজ্ঞানের প্রয়োগ—যাহার প্রমাণ আমরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের সূত্রপাতে

বুঝিতে পারি। শিক্ষার ব্যবস্থা কত বিজ্ঞানসম্মত হইয়াছে; শিক্ষার্থীর আগ্রহ, শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা, শিক্ষণীয় বিষয়ের পারস্পরিক সম্বন্ধ প্রভৃতি খুঁজিয়া পাওয়ার সুযোগ ঘটিয়াছে।

তবে যে প্রগতিশীল স্কুলের শিক্ষার্থীর উন্নতির মান এখনও খুব বেশী উচ্চ হয় নাই, তাহার কারণ দুইটি :—প্রথমতঃ, তথাকথিত প্রগতিশীল স্কুল এখনও সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞানসম্মত পথে চলিবার অবকাশ পাইতেছে না। যেমন একদিকে ছাত্রদের নিজ নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী পাঠক্রম নির্দিষ্ট হয় না, তেমনই যে বিষয়গুলি পড়িবার কোন অর্থ হয় না সেগুলিও সব বাদ দেওয়া হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, যে সমস্ত পরীক্ষা লওয়া হয় সেগুলি পুরাতন প্রথা অনুযায়ী চলিতেছে; যেমন অসংলগ্ন সংবাদের উপর জোর রহিয়াছে, তেমন অপ্রয়োজনীয় অঙ্কও জিজ্ঞাসা করা হইতেছে; বিশেষ করিয়া ভালভাবে বুঝিবার ক্ষমতার পরীক্ষা ইহা নহে; ইহাতে কেবল মুখস্থ করিবার নিপুণতা বিচার করা হয়।

এগুলি থাকা সত্ত্বেও ভালদরের প্রগতিশীল স্কুলের ছাত্রেরা প্রাচীনপদ্ধতির পরীক্ষাতেও সর্বদা অপেক্ষাকৃত অধিক সাফল্য লাভ করে।

শিক্ষার প্রতি বিদ্যার্থীর কি প্রকারের মনোভাব গড়িয়া উঠিতেছে, স্কুলের প্রতি তাহার অনুরাগ কিংবা বিতৃষ্ণা জন্মিতেছে—এইসব বিষয় প্রাচীনপন্থীরা নেহাৎ অবহেলা করিয়া চলেন। প্রগতিশীল ব্যক্তিরা শিক্ষার্থীদের একটি স্বাস্থ্যকর

মনোভাব গঠনের প্রতি বিশেষ যত্নবান। ছাত্রের মনে শিখিবার আগ্রহ প্রবলভাবে জাগাইয়া তুলিবার প্রয়াস এবং যাহাতে বিদ্যালয় ছাড়িয়া যাইবার পরেও সেই আগ্রহ প্রবলভাবে জাগ্রত থাকে প্রগতিশীল স্কুলে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়। এই ব্যাপারে ইহাদের সফলতা অতুলনীয়।

নিয়মনিষ্ঠা

পুরাতনপন্থী স্কুলে 'নিয়মানুবর্তিতা' (discipline) রক্ষা করা হয় বলিয়া একটা গর্ব আছে। শিক্ষকের আভিজাত্য এবং দক্ষতা ক্লাশে 'ডিসিপ্লিন' রাখার নিপুণতা দিয়া বিচার করা হয়। অনুশাসনের মাপকাঠি হইতেছে এই যে, ছেলেরা "ক্লাশে চুপ করিয়া বসিবে" এবং কোন প্রকারেও তাহার অন্যথা হইতে পারিবে না, যাহা করিতে বলা হইবে শিক্ষার্থীরা তাহাই করিবে, ইত্যাদি। তাহাদের অনুশাসনের অবহেলা কি করিয়া হয় ?

প্রগতিশীল স্কুলে বাধ্যতার বিশেষ উচ্চস্থান রহিয়াছে। সময়ে শিক্ষককে জোর করিয়াও হয়ত তাহা আদায় করিতে হয় ; কিন্তু আসল কাজ হইতেছে—শিক্ষার্থীদের আত্ম-শাসনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে সাহায্য করা ; যাহাতে বিনা তদারকেও তাহারা কর্তব্যে অবহেলা না করে। শিক্ষকের মতামতের সাহায্যে সাধারণ আচারের নিয়মগুলি লিপিবদ্ধ হয় ; কিন্তু তাহাও ছেলেরাই শিক্ষকের নির্দেশে করিবে, ফলে

কর্মক্ষেত্রে সহযোগিতা এবং হৃদ্যতার এক আবহাওয়া অনুভব করা যায়। ছেলেরা একে অপরের ব্যাপারে যেমন উৎসাহী হয়, তেমনই সাহায্য করিবার জন্য সর্বদা অগ্রসর হইয়া আসে। বাহিরের লোকের কাছেও কর্মস্থল নেহাৎ অগোছালো এবং বিশৃঙ্খল মনে হইতে পারে। কিন্তু সেখানে যথেষ্ট স্ফূর্তি ও স্বাধীনতা রহিয়াছে। আবার কোন শিক্ষক অথবা শিক্ষার্থী কোন কথা বলিলে সকলেই সে কথা যেমন মন দিয়া শুনিবে, তেমনই ক্ষণেকের মধ্যেই তাহারা গভীর আলোচনায় নিযুক্ত হইয়াছে দেখা যায়। ক্লাশে চুপচাপ বসিয়া পড়িবার প্রয়োজন হইলে সুন্দর, শান্ত, আবহাওয়াও দেখা যাইবে—মনে হইবে এখানে যেন সুনিয়ন্ত্রিত কোন এক লাইব্রেরীর শৃঙ্খলা ও শান্তি বিরাজ করিতেছে। কেহ উঠিয়া গিয়া কোন বই আনিতেছে, কেহ কাহাকেও আকর্ষণীয় কিছু দেখাইতেছে, কেহ কাহাকেও নিম্নস্বরে কিছু বলিতেছে—বিনা ব্যাঘাতে নীরবে সকলেই সকল কাজ করিয়া যাইতেছে।

যে ছেলেকে শাসন করিবার প্রয়োজন হয়, হয়ত কাহাকেও ক্ষ্যাপানো, মারধর করা, গোলমাল করা ইত্যাদি যাহার স্বভাব, তাহাকে শাসন করিবার জন্য হয়ত প্রথমে পুরাতন প্রথামত দণ্ডের ব্যবস্থা করিতে হইবে—অন্যদের রক্ষা করিবার জন্য। কিন্তু শিক্ষক জানেন যে তাহাকে দমন করিলেই রোগ আরোগ্য হইবে না। উহা ত সাময়িক উপায়মাত্র। ক্রমে তাহাকে লোকে দোষী না বলিয়া বলিবে রোগী; সাধারণ ব্যবহারে

তাহার ব্যতিক্রম স্বভাবতঃ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। পিতামাতার কাছে এবং সময়ে সময়ে মনস্তত্ত্ববিদের সাহায্যে তাহার স্বভাবের বিশেষত্ব জানা যাইবে। তাহার আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থতার কথাও ভাবিতে হইবে—বিশেষ করিয়া সকলের অভিমত অনুযায়ী এবং সর্বসাধারণের গ্রাহ্য কোন উপায় তাহার জন্য উদ্‌ভাবন করিতে হইবে। যতক্ষণ না জীবনযাত্রার সহিত তাহার শান্তিপূর্ণ বোঝাপড়া হয়, যতক্ষণ তাহার নিজের সঙ্গে ও অপরের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া থাকিবার ক্ষমতা যথেষ্ট না হয় ততক্ষণ তাহাকে সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক বলা হইতে পারে না।

চরিত্রগঠন

চরিত্রগঠনের শিক্ষা স্কুলের একটি বিশেষ কর্তব্য। প্রাচীন প্রথায় এ কথার অর্থ ছিল সকল রকম বাধ্যতা এবং নৈতিক ব্যবহারের উপরে জোর দেওয়া। বাধ্যতার মূল্য নিরূপণ হইত নিন্দা এবং প্রশংসার ভিতর দিয়া, কিংবা শাস্তি এবং পুরস্কারের সাহায্যে। ফলে গুরুজনস্থানীয়দের উপস্থিতিকালে উহা যদিবা কার্যকরী হইত, তাঁহাদের অনুপস্থিতির সুযোগে আসিত অবাধ্যতা।

কিন্তু প্রগতিশীল ব্যক্তিদের কাছে ‘চরিত্র’ কথাটির অর্থ অত্যন্ত গভীর। সম্মুখে দৃষ্টি প্রসারিত করিবার যাহার দৃঢ়তা আছে, নীতির তাৎপর্য ওজন করিবার অর্থাৎ বিচার করিবার

ক্ষমতা যাহার আছে, তাহাকেই চরিত্রবান বলিব। কোন দলের বা গোষ্ঠীর একজন বলিয়া যেমন সে নিজেকে মনে করিবে, তেমন ইহাও খেয়াল থাকা চাই যে তাহার গোষ্ঠী বৃহত্তর সমাজেরই অংশবিশেষ। যে জিনিস তাহার চাই সে জিনিস চাওয়া এবং পাওয়া সম্ভব কিনা, চাওয়া এবং পাওয়া বাঞ্ছনীয় কিনা—তাহাও তাহার জানিতে হইবে। কাজেই নিজেকে অন্যের সুখ ও সুবিধার সঙ্গে সর্বতোভাবে জড়াইয়া ফেলিতে হইবে। এই গণ্ডী বৃহৎ হইতে বৃহত্তর হইবে—যেমন একটি প্রাণী হইতে গোটা পরিবার তাহার সহপাঠীর দল, ক্রীড়া-সহচর, স্কুল, সমাজ, দেশ এবং বিরাট বিশ্বের মানব-জাতি ইত্যাদির সঙ্গে তাহার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হইবে।

কিন্তু বৌদ্ধিক সূচনা অথবা আবেগই তো যথেষ্ট নহে, হৃদয়েরও স্পর্শ চাই; চাই বন্ধুত্বের সম্পর্ক, বন্ধুর সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের সুবিধার জন্য প্রবল বাসনা।

এইরকম দূরদর্শিতা ও সামাজিকতার মনোবৃত্তি শিক্ষা করা বহুদিনের শিক্ষা ও সাধনার ফল। শুধু বাধ্যতার জোরেই ইহা লাভ হয় না। ইহার সহিত আত্ম-অনুশাসনের ভাব থাকিবে; তাহা ছাড়া ইচ্ছাশক্তি, যোগ্যতা এবং আপন অন্তর্দৃষ্টি অনুযায়ী কাজ করিবার ক্ষমতাও আসিবে।

মানুষ নিজের ভুলত্রুটির সম্বন্ধে সচেতন হইতে পারে একমাত্র স্বাধীনভাবে কাজ করিবার সুযোগের মধ্য দিয়া। স্বাধীনভাবে কাজ করিবার সুযোগ না আসিলে আত্ম-শাসন

অভ্যাস করিতে বিলম্ব হইবে। জ্ঞানী শিক্ষকের সাহায্য বিনা নিজেদের অভিজ্ঞতার সম্পূর্ণ তাৎপর্য তাহারা বুঝিতে পারিবে না। জ্ঞান অঙ্কুরিত না হওয়া পর্যন্ত তাহারা সমাজের অংশ-বিশেষে তাহাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের গুরুত্ব সম্বন্ধেও সচেতন হইবে না, সেই সমাজের উপর তাহারা কতটা নির্ভরশীল তাহাও জানিবে না। অন্তরে অনুভূতির তৃপ্তি এবং সামাজিক সমন্বয় না হওয়া পর্যন্ত তাহারা পদে পদে অপরের শুধু বাধাই জন্মাইবে, এ কথা ছাত্রেরা বুঝিবে না।

সুতরাং প্রগতিশীল স্কুলে কার্যক্রমের সমস্ত কিছুই উন্নততর চরিত্রগঠনের প্রতি অবহিত।

নাগরিকতা

সমাজের কিংবা দেশের কিংবা জগতের প্রতি দায়িত্ব বোধের দরুণ চরিত্রের যে বিকাশ তাহাকে নাগরিকতা বলা যাইতে পারে। নূতন এবং পুরাতন সমস্ত স্কুলই স্বীকার করে যে ছেলেমেয়েদের সক্ষম নাগরিকরূপে তৈরী করিবার দায়িত্ব স্কুলের। কিন্তু প্রাচীন ও নবীন দুই স্কুলের মধ্যে দুই ভিন্ন উপায়ে ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে।

প্রাচীন প্রথায় নাগরিকতার দায়িত্ব এবং শিক্ষার ব্যবস্থা কিই বা ছিল? ছেলেরা নেহাৎ বাধ্য ও অধীন প্রজার ন্যায় ব্যবহার করিত; কিন্তু কর্মঠ স্বাধীন নাগরিক বলিয়া নিজেদের মনে করিতে পারিত না। ছাত্রসংসদের দায়িত্ব কেবলমাত্র

প্রতিনিধি নির্বাচনেই ছিল ; এবং সে প্রতিনিধিরও কাজ ছিল ক্লাশের বাহিরে কোন রকমে সংসদের কাজ চালিত করা। অর্থাৎ মুখ্যত স্কুলের শিক্ষা অথবা অন্যান্য উন্নতির সাধনকল্পে কোনরূপ পরিকল্পনা তৈরীতে ইহাদের হাত ছিল না।

প্রগতিশীল স্কুলে ছাত্রজীবনের সমস্ত কিছুর আরম্ভেই নাগরিকতার ভাব জাগাইয়া তোলা হয়। ছাত্রসংসদ গণতন্ত্রের নিয়মে গঠিত হয়। প্রত্যেকের দাবি, প্রত্যেকের মতামত, মতদ্বৈধ ইত্যাদি সব কিছুই সমান মর্যাদা পায়। সহ-অনুযোজনা এবং সহকর্ম দৈনন্দিন কাজের মূল। কাজেই প্রথম হইতেই স্কুলের প্রতিটি ধাপে ছেলেরা গণতন্ত্রের আস্বাদ পাইয়া থাকে।

ইতিহাস, ভূগোল, রাজনীতি এই সব মিলাইয়া সমাজনীতি অথবা সামাজিক শাস্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছে। দৈনন্দিন কার্যক্রমে এই সব সমস্যার ও কার্যপ্রণালীর সম্মুখীন হইতে হয় বলিয়া সমাজের বৃহত্তর সমস্যার খানিকটা তাহারা বুঝিতে শেখে, নিজেদের সম্বন্ধে ভাবিতে শেখে। মৌলিক চিন্তাশক্তি কাজে লাগাইবার ক্ষমতা এবং নেতৃত্ব গ্রহণের যোগ্যতার পূর্ণ বিকাশের সুযোগও ঘটে। কোন নীতিনিয়ম, কার্যকারণ বিচার করা ও গ্রহণ করা—একমাত্র গণতন্ত্রই শিখাইতে পারে।

এই সাতটি প্রধান লক্ষণই প্রাচীন ও নবীন স্কুলের সকল পার্থক্য নহে। ইহা হইতে যে দুইটি প্রধান কথা বোঝা যায় তাহা এই :—

প্রথমতঃ প্রগতিশীল শিক্ষার উদ্দেশ্য বৃহৎ; সমস্ত শিশুটিকে লইয়া উহার কারবার। ইহাতে একদিকে শিশুর ব্যক্তিগত ও অপরদিকে সামাজিক বিকাশের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। সুতরাং কেবল জ্ঞান অথবা কর্মের নিপুণতাই আমরা আশা করি না, আশা করি আরও অনেক কিছুর।

দ্বিতীয়তঃ, প্রাচীন স্কুলে বিজ্ঞানের নূতন আবিষ্কার প্রয়োগ করা হইতেছে না; বরং নূতন আবিষ্কারের প্রত্যক্ষ অবহেলা দেখা যায়। অপর পক্ষে প্রগতিশীল শিক্ষায় ইহার পরিপূর্ণ প্রয়োগ অবশ্যই ঘটিয়া থাকে।

নূতন শিক্ষার উদ্দেশ্য যেমন মহৎ এবং উদার, তেমনই বৃহত্তর ক্ষেত্রের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিবার আশা করা হয় বলিয়াই এই শিক্ষাব্যবস্থায় সমাজ ও অভিভাবক গোষ্ঠীর সহিত যোগাযোগ চলে। তবে তাহাদের এখনও সম্পূর্ণভাবে এই মহৎ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলিতে পারা যায় নাই।

সুতরাং ইহার বিরুদ্ধে অনেক কিছুই বলা হয়।

প্রধান অভিযোগ হিসাবে বলা হয় যে, জ্ঞানের অভাব ছাত্রদের মধ্যে থাকিয়া যায়।

বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে দেখা গিয়াছে যে, প্রগতিশীল শিক্ষা প্রকৃতই উন্নততর আদর্শ সামনে রাখিয়া সফলতার পথে অগ্রসর হইতেছে। প্রগতির সঙ্গে তাল রাখিয়া বিজ্ঞানের ফলাফলের সাহায্যে এই শিক্ষাকে আরও দ্রুত উন্নতির পথে

লইয়া যাইতে হইবে। এই শিক্ষাব্যবস্থায় যাঁহারা মানুষ হইতেছেন তাঁহারা চরিত্রের পরিপূর্ণ বিকাশ, যোগ্যতা এবং ক্ষমতার বলে গণতন্ত্রের সার্থক নাগরিক হইবার যোগ্য হইবেন।